বীথিকা

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়
২ বঙ্কিম চাটুজ্জে স্ট্রীট, কলিকাতা

প্রকাশক শ্রীপুলিনবিহারী সেন
বিশ্বভারতী, ৬।৩ দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন, কলিকাতা

প্রকাশ : ভাদ্র ১৩৪২
পুনর্মুদ্রণ : জ্যৈষ্ঠ ১৩৫১
পুনর্মুদ্রণ : ভাদ্র ১৩৫২

মুদ্রাকর শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়
শান্তিনিকেতন প্রেস, শান্তিনিকেতন

৫০০০—২৫. ৮. ৪৫

সূচীপত্র

কবিতা		পৃষ্ঠা

প্রথম ছত্রের সূচী

প্রথম ছত্র | পৃষ্ঠা

বীথিকা

অতীতের ছায়া

মহা-অতীতের সাথে আজ আমি করেছি মিতালি-
দিবালোক-অবসানে তারালোক জ্বালি
ধ্যানে যেথা বসেছে সে
রূপহীন দেশে ;
যেথা অস্তসূর্য হতে নিয়ে রক্তরাগ
গুহাচিত্রে করিছে সজাগ
তার তুলি
ম্রিয়মাণ জীবনের লুপ্ত রেখাগুলি ;
নিমীলিত বসন্তের ক্লান্তগন্ধে যেখানে সে
গাঁথিয়া অদৃশ্যমালা পরিছে নিবিড় কালোকেশে ;
যেখানে তাহার কণ্ঠহারে
দুলায়েছে সারে সারে
প্রাচীন শতাব্দীগুলি শান্ত-চিত্তদহন বেদনা
মাণিক্যের কণা ।
সেথা বসে আছি কাজ ভুলে
অস্তাচলমূলে
ছায়াবীথিকায় ।
রূপময় বিশ্বধারা অবলুপ্তপ্রায়
গোধূলিধূসর আবরণে,
অতীতের শূন্য তার সৃষ্টি মেলিতেছে মোর মনে ।
এ শূন্য তো মরুমাত্র নয়
এ যে চিত্তময় ;
বর্তমান যেতে যেতে এই শূন্যে যায় ভ'রে রেখে
আপন অন্তর থেকে,
অসংখ্য স্বপন ;
অতীত এ শূন্য দিয়ে করিছে বপন
বস্তুহীন সৃষ্টি যত,

নিত্যকাল-মাঝে তারি কল্যশস্য ফলিছে নিয়ত।
আলোড়িত এই শূন্য যুগে যুগে উঠিয়াছে জ্বলি,
ভরিয়াছে জ্যোতির অঞ্জলি।
বসে আছি নির্নিমেষ চোখে
অতীতের সেই ধ্যানলোকে—
নিঃশব্দ তিমিরতটে জীবনের বিস্মৃত রাতির।

হে অতীত,
শান্ত তুমি নির্বাণ-বাতির
অন্ধকারে,
সুখদুঃখনিষ্কৃতির পারে।
শিল্পী তুমি, আঁধারের ভূমিকায়
নিভৃতে রচিছ সৃষ্টি নিরাসক্ত নির্মম কলায়,
স্মরণে ও বিস্মরণে বিগলিত বর্ণ দিয়া লিখা
বর্ণিতেছ আখ্যায়িকা;
পুরাতন ছায়াপথে নূতন তারার মতো
উজ্জ্বলি উঠিছে কত,
কত তার নিভাইছ একেবারে
যুগান্তের অশান্ত ফুৎকারে।
আজ আমি তোমার দোসর,
আশ্রয় নিতেছি সেথা যেথা আছে মহা-অগোচর।
তব অধিকার আজি দিনে দিনে ব্যাপ্ত হয়ে আসে
আমার আয়ুর ইতিহাসে।
সেথা তব সৃষ্টির মন্দিরদ্বারে
আমার রচনাশালা স্থাপন করেছি একধারে
তোমারি বিহারবনে ছায়াবীথিকায়।
ঘুচিল কর্মের দায়,

ক্লান্ত হল লোকমুখে খ্যাতির আগ্রহ ;
দুঃখ যত সয়েছি দুঃসহ
তাপ তার করি অপগত
মূর্তি তারে দিব নানামতো
আপনার মনে মনে।
কলকোলাহলশান্ত জনশূন্য তোমার প্রাঙ্গণে,
যেখানে মিটেছে দ্বন্দ্ব মন্দ ও ভালোয়,
তারার আলোয়
সেখানে তোমার পাশে আমার আসন পাতা,—
কর্মহীন আমি সেথা বন্ধহীন সৃষ্টির বিধাতা।

১৩ জুলাই-২ অগস্ট, ১৯৩৫
শান্তিনিকেতন

মাটি

বাঁখারির বেড়া-দেওয়া ভূমি ; হেথা করি ঘোরাফেরা

সারাক্ষণ আমি-দিয়ে ঘেরা

বর্ত্তমানে।

মন জানে

এ মাটি আমারি,

যেমন এ শালতরুসারি

বাঁধে নিজ তলবীথি শিকড়ের গভীর বিস্তারে

দূর শতাব্দীর অধিকারে।

হেথা কৃষ্ণচূড়াশাখে ঝরে শ্রাবণের বারি

সে যেন আমারি,—

ভোরে ঘুমভাঙা আলো, রাত্রে তারাজ্বালা অন্ধকার,

যেন সে আমারি আপনার

এ মাটির সীমাটুকু-মাঝে।

আমার সকল খেলা, সব কাজে,

এ ভূমি জড়িত আছে শাশ্বতের যেন সে লিখন।

হঠাৎ চমক ভাঙে নিশীথে যখন

সপ্তর্ষির চিরন্তন দৃষ্টিতলে,

ধ্যানে দেখি, কালের যাত্রীর দল চলে

যুগে যুগান্তরে।

এই ভূমিখণ্ড-'পরে

তারা এল, তারা গেল কত।

তারাও আমারি মতো

এ মাটি নিয়েছে ঘেরি,—

জেনেছিল, একান্ত এ তাহাদেরি।

কেহ আর্য কেহ বা অনার্য তারা,

কত জাতি নামহীন ইতিহাসহারা।

কেহ হোমাগ্নিতে হেথা দিয়েছিল হবির অঞ্জলি,
কেহ বা দিয়েছে নরবলি।
এ মাটিতে একদিন যাহাদের সুপ্তচোখে
জাগরণ এনেছিল অরুণ-আলোকে
বিলুপ্ত তাদের ভাষা।
পরে পরে যারা বেঁধেছিল বাসা,
সুখে দুঃখে জীবনের রসধারা
মাটির পাত্রের মতো প্রতি ক্ষণে ভরেছিল যারা
এ ভূমিতে,
এরে তারা পারল না কোনো চিহ্ন দিতে।

আসে যায়
ঋতুর পর্যায়,
আবর্তিত অন্তহীন
রাত্রি আর দিন;
মেঘরৌদ্র এর 'পরে
ছায়ার খেলেনা নিয়ে খেলা করে
আদিকাল হতে।
কালস্রোতে
আগন্তুক এসেছি হেথায়
সত্য কিম্বা দ্বাপরে ত্রেতায়
যেখানে পড়েনি লেখা
রাজকীয় স্বাক্ষরের একটিও স্থায়ী রেখা।

হায় আমি,
হায় রে ভূস্বামী,
এখানে তুলিছ বেড়া,— উপাড়িছ হেথা যেই তৃণ
এ মাটিতে সে-ই রবে লীন

পুনঃ পুনঃ বৎসরে বৎসরে। তারপরে !—
এই ধূলি রবে পড়ি আমি-শূন্য চিরকাল-তরে

২ অগস্ট, ১৯৩৫
শান্তিনিকেতন

দুজন

সূর্যাস্তদিগন্ত হতে বর্ণচ্ছটা উঠেছে উচ্ছ্বাসি।
দুজনে বসেছে পাশাপাশি।
সমস্ত শরীরে মনে লইতেছে টানি
আকাশের বাণী।
চোখেতে পলক নাই, মুখে নাই কথা,
স্তব্ধ চঞ্চলতা।

একদিন যুগলের যাত্রা হয়েছিল শুরু,
বক্ষ করেছিল দুরু দুরু
অনির্বচনীয় সুখে।
বর্তমান মুহূর্তের দৃষ্টির সম্মুখে
তাদের মিলনগ্রন্থি হয়েছিল বাঁধা।
সে-মুহূর্ত পরিপূর্ণ; নাই তাহে বাধা,
দ্বন্দ্ব নাই, নাই ভয়,
নাইকো সংশয়।
সে মুহূর্ত বাঁশির গানের মতো;
অসীমতা তার কেন্দ্রে রয়েছে সংহত।
সে-মুহূর্ত উৎসের মতন;
একটি সংকীর্ণ মহাক্ষণ
উচ্ছলিত দেয় ঢেলে আপনার সবকিছু দান।
সে-সম্পদ দেখা দেয় লয়ে নৃত্য, লয়ে গান,
লয়ে সূর্যালোকভরা হাসি,
ফেনিল কল্লোল রাশি রাশি।
সে-মুহূর্তধারা
ক্রমে আজ হল হারা
সুদূরের মাঝে।
সে-সুদূরে বাজে

মহাসমুদ্রের গাথা।
সেইখানে আঁছে পাতা
বিরাটের মহাসন কালের প্রাঙ্গণে।
সর্ব দুঃখ, সর্ব সুখ মেলে সেথা প্রকাণ্ড মিলনে।
সেথা আকাশের পটে
অস্ত-উদয়ের শৈলতটে
রবিচ্ছবি আঁকিল যে অপরূপ মায়া
তারি সঙ্গে গাঁথা পড়ে রজনীর ছায়া।

সেথা আজ যাত্রী দুইজনে
শান্ত হয়ে চেয়ে আছে সুদূর গগনে।
কিছুতে বুঝিতে নাহি পারে
কেন বারে বারে
দুই চক্ষু ভরে ওঠে জলে।
ভাবনার সুগভীর তলে
ভাবনার অতীত যে-ভাষা
করিয়াছে বাসা
অকথিত কোন্ কথা
কী বারতা
কাঁপাইছে বক্ষের পঞ্জরে।
বিশ্বের বৃহৎ বাণী লেখা আছে যে মায়া-অক্ষরে,
তার মধ্যে কতটুকু শ্লোকে
ওদের মিলনলিপি, চিহ্ন তার পড়েছে কি চোখে

২৫ জুলাই, ১৯৩২
শান্তিনিকেতন

রাত্রিরূপিণী

হে রাত্রিরূপিণী,
আলো জ্বালো একবার ভালো করে চিনি।
দিন যার ক্লান্ত হল তারি লাগি কী এনেছ বর,
জানাক তা তব মৃদু স্বর।
তোমার নিশ্বাসে
ভাবনা ভরিল মোর সৌরভ-আভাসে।
বুঝিবা বক্ষের কাছে
ঢাকা আছে
রজনীগন্ধার ডালি।
বুঝিবা এনেছ জ্বালি
প্রচ্ছন্ন ললাটনেত্রে সন্ধ্যার সঙ্গিনীহীন তারা—
গোপন আলোক তারি, ওগো বাক্যহারা
পড়েছে তোমার মৌন-'পরে—
এনেছে গভীর হাসি করুণ অধরে
বিষাদের মতো শান্ত স্থির।
দিবসে সুতীব্র আলো, বিক্ষিপ্ত সমীর
নিরন্তর আন্দোলন,
অনুক্ষণ
দ্বন্দ্ব-আলোড়িত কোলাহল।

তুমি এসো অচঞ্চল,
এসো স্নিগ্ধ আবির্ভাব,
তোমারি অঞ্চলতলে লুপ্ত হোক যত ক্ষতি লাভ।
তোমার স্তব্ধতাখানি
দাও টানি
অধীর উদ্‌ভ্রান্ত মনে।
যে অনাদি নিঃশব্দতা সৃষ্টির প্রাঙ্গণে

বহ্নিদীপ্ত উদ্যমের মত্ততার জ্বর
শান্ত করি করে তারে সংযত সুন্দর,
সে গম্ভীর শান্তি আনো তব আলিঙ্গনে
ক্ষুব্ধ এ জীবনে।
তব প্রেমে
চিত্তে মোর যাক থেমে
অন্তহীন প্রয়াসের লক্ষ্যহীন চাঞ্চল্যের মোহ
দুরাশার দুরন্ত বিদ্রোহ।
সপ্তর্ষির তপোবনে হোমহুতাশন হতে
আনো তব দীপ্ত শিখা। তাহারি আলোতে
নির্জনের উৎসব-আলোক
পুণ্য হবে, সেইক্ষণে আমাদের শুভদৃষ্টি হোক।
অপ্রমত্ত মিলনের মন্ত্র সুগম্ভীর
মন্ত্রিত করুক আজি রজনীর তিমিরমন্দির।

৭ মাঘ, ১৩৩৮

ধ্যান

কাল চলে আসিযাছি, কোনো কথা বলিনি তোমাবে।
শেষ করে দিনু একেবারে
আশা নৈরাশ্যের দ্বন্দ্ব, ক্ষুব্ধ কামনাব
দুঃসহ ধিক্কার।
বিরহের বিষণ্ণ আকাশে
সন্ধ্যা হয়ে আসে।
তোমারে নিরখি ধ্যানে সব হতে স্বতন্ত্র করিয়া
অনন্তে ধরিয়া।
নাই সৃষ্টিধারা,
নাই রবি শশী গ্রহতারা ;
বায়ু স্তব্ধ আছে,
দিগন্তে একটি রেখা আঁকে নাই গাছে।
নাইকো জনতা,
নাই কানাকানি কথা।

নাই সময়ের পদধ্বনি—
নিরন্ত মুহূর্ত স্থির, দণ্ড পল কিছুই না গণি।
নাই আলো, নাই অন্ধকার,—
আমি নাই, গ্রন্থি নাই তোমার আমার।
নাই সুখ দুঃখ ভয়, আকাঙ্ক্ষা বিলুপ্ত হল সব,—
আকাশে নিস্তব্ধ এক শান্ত অনুভব।
তোমাতে সমস্ত লীন, তুমি আছ একা—
আমি-হীন চিত্ত-মাঝে একান্ত তোমাবে শুধু দেখা

৩ জুলাই, ১৯৩২

কৈশোরিকা

হে কৈশোরের প্রিয়া,
ভোরবেলাকার আলোক-আঁধার-লাগা
চলেছিলে তুমি আধঘুমো-আধজাগা
মোর জীবনের ঘন বনপথ দিয়া।
ছায়ায় ছায়ায় আমি ফিরিতাম একা,
দেখি দেখি করি শুধু হয়েছিল দেখা
চকিত পায়ের চলার ইশারাখানি।
চুলের গন্ধে ফুলের গন্ধে মিলে
পিছে পিছে তব বাতাসে চিহ্ন দিলে
বাসনার রেখা টানি।

প্রভাত উঠিল ফুটি ;
অরুণরাঙিমা দিগন্তে গেল ঘুচে,
শিশিরের কণা কুঁড়ি হতে গেল মুছে,
গাহিল কুঞ্জে কপোতকপোতী দুটি।
ছায়াবীথি হতে বাহিরে আসিলে ধীরে
ভরা জোয়ারের উচ্ছল নদীতীরে—
প্রাণকল্লোলে মুখর পল্লিবাটে।
আমি কহিলাম, "তোমাতে আমাতে চলো,
তরুণ রৌদ্র জলে করে ঝলোমলো,—
নৌকা রয়েছে ঘাটে।"

স্রোতে চলে তরী ভাসি।
জীবনের-স্মৃতি-সঞ্চয়-করা তরী
দিনরজনীর সুখে দুখে গেছে ভরি,
আছে গানে-গাঁথা কত কান্না ও হাসি।

পেলব প্রাণের প্রথম পরশ নিয়ে
সে তরণী-'পরে পা ফেলেছ তুমি প্রিয়ে,
পাশাপাশি সেথা খেয়েছি ঢেউয়ের দোলা।
কখনো বা কথা কয়েছিলে কানে কানে,
কখনো বা মুখে ছলোছলো দুনয়ানে
চেয়েছিলে ভাষাভোলা।

বাতাস লাগিল পালে;
ভাঁটার বেলায় তরী যবে যায় থেমে
অচেনা পুলিনে কবে গিয়েছিলে নেমে
মলিন ছায়ার ধূসর গোধূলিকালে।
আবার রচিলে নব কুহকের পালা,
সাজালে ডালিতে নূতন বরণমালা,
নয়নে আনিলে নূতন চেনার হাসি।
কোন্ সাগরের অধীর জোয়ার লেগে
আবার নদীর নাড়ী নেচে ওঠে বেগে,
আবার চলিনু ভাসি।

তুমি ভেসে চল সাথে।
চিররূপখানি নবরূপে আসে প্রাণে;
নানা পরশের মাধুরীর মাঝখানে
তোমারি সে হাত মিলেছে আমার হাতে।
গোপন গভীর রহস্যে অবিরত
ঋতুতে ঋতুতে সুরের ফসল কত
ফলায়ে তুলেছ বিস্মিত মোর গীতে।
শুকতারা তব কয়েছিল যে কথারে
সন্ধ্যার আলো সোনায় গলায় তারে
সকরুণ পুরবীতে।

চিনি, নাহি চিনি তবু।
প্রতি দিবসের সংসার-মাঝে তুমি
স্পর্শ করিয়া আছ যে-মর্ত্যভূমি
তার আবরণ খসে পড়ে যদি কভু,
তখন তোমার মুরতি দীপ্তিমতী
প্রকাশ করিবে আপন অমরাবতী
সকল কালের বিরহের মহাকাশে।
তাহারি বেদনা কত কীর্তির স্তূপে
উচ্ছ্রিত হয়ে ওঠে অসংখ্য রূপে
পুরুষের ইতিহাসে।

হে কৈশোরের প্রিয়া,
এ জনমে তুমি নব জীবনের দ্বারে
কোন্ পার হতে এনে দিলে মোর পারে
অনাদি যুগের চিরমানবীর হিয়া।
দেশের কালের অতীত যে মহাদূর,
তোমার কণ্ঠে শুনেছি তাহারি সুর,—
বাক্য সেথায় নত হয় পরাভবে
অসীমের দূতী, ভরে এনেছিলে ডালা
পরাতে আমারে নন্দন-ফুলমালা
অপূর্ব গৌরবে।

৯ মাঘ, ১৩৪০

সত্যরূপ

অন্ধকারে জানি না কে এল কোথা হতে,—
মনে হল তুমি ;
রাতের লতা-বিতান তারার আলোতে
উঠিল কুসুমি।
সাক্ষ্য আর কিছু নাই, আছে শুধু একটি স্বাক্ষর,
প্রভাত-আলোকতলে মগ্ন হলে প্রসুপ্ত প্রহর
পড়িব তখন।
ততক্ষণ পূর্ণ করি থাক্ মোর নিস্তব্ধ অন্তর
তোমার স্মরণ।

কত লোক ভিড় করে জীবনের পথে
উড়াইয়া ধূলি ;
কত যে পতাকা ওড়ে কত রাজরথে
আকাশ আকুলি।
প্রহরে প্রহরে যাত্রী ধেয়ে চলে খেয়ার উদ্দেশে,—
অতিথি আশ্রয় মাগে শ্রান্তদেহে মোর দ্বারে এসে
দিন-অবসানে,
দূরের কাহিনী বলে, তার পরে রজনীর শেষে
যায় দূরপানে।

মায়ার আবর্ত রচে আসায় যাওয়ায়
চঞ্চল সংসারে।
ছায়ার তরঙ্গ যেন ধাইছে হাওয়ায়
ভাঁটায় জোয়ারে।
উর্ধ্বকণ্ঠে ডাকে কেহ, স্তব্ধ কেহ ঘরে এসে বসে—
প্রত্যহের জানাশোনা, তবু তারা দিবসে দিবসে
পরিচয়হীন ;

এই কুজ্ঝটিকালোকে লুপ্ত হয়ে স্বপ্নের তামসে
কাটে জীর্ণ দিন।

সন্ধ্যার নৈঃশব্দ উঠে সহসা শিহরি ;
না কহিয়া কথা
কখন্ যে আস কাছে, দাও ছিন্ন করি
মোর অস্পষ্টতা।
তখন বুঝিতে পারি, আছি আমি একান্তই আছি
মহাকালদেবতার অন্তরের অতি কাছাকাছি
মহেন্দ্রমন্দিরে ;
জাগ্রত জীবনলক্ষ্মী পরায় আপন মাল্যগাছি
উন্নমিত শিরে।

তখনি বুঝিতে পারি, বিশ্বের মহিমা
উচ্ছ্বসিয়া উঠি
রাখিল সত্তায় মোর রচি নিজ সীমা
আপন দেউটি।
সৃষ্টির প্রাঙ্গণতলে চেতনার দীপশ্রেণী-মাঝে
সে দীপে জ্বলেছে শিখা উৎসবের ঘোষণার কাজে ;
সেই তো বাখানে,
অনির্বচনীয় প্রেম অন্তহীন বিস্ময়ে বিরাজে
দেহে মনে প্রাণে।

৫ শ্রাবণ, ১৩৪০

প্রত্যর্পণ

করিব রচনা তব মন্দিরে
জ্বালে ছন্দের ধূপ।
সে মায়াবাষ্পে আকার লভিল
তোমার ভাবের রূপ।
লভিলে হে নারী, তনুর অতীত তনু,
পরশ-এড়ানো সে যেন ইন্দ্রধনু
নানা রশ্মিতে রাঙা ;
পেলে রসধারা অমর বাণীর
অমৃতপাত্র-ভাঙা।

কামনা তোমায় বহে নিয়ে যায়
কামনার পরপারে।
সুদূরে তোমার আসন রচিয়া
ফাঁকি দেয় আপনারে।
ধ্যানপ্রতিমারে স্বপ্নরেখায় আঁকে,
অপরূপ অবগুণ্ঠনে তারে ঢাকে,
অজানা করিয়া তোলে।
আবরণ তার ঘুচাতে না চায়
স্বপ্ন ভাঙিবে ব'লে।

ঐ যে মুরতি হয়েছে ভূষিত
মুগ্ধ মনের দানে,
আমার প্রাণের নিশ্বাসতাপে
ভরিয়া উঠিল প্রাণে ;
এর মাঝে এল কিশোর শক্তি সে যে,
দাঁড়াল সমুখে হোমহুতাশন-তেজে,
পেল সে পরশমণি।

নয়নে তাহার জাগিল কেমনে
জাদুমন্ত্রের ধ্বনি।

যে দান পেয়েছে তার বেশি দান
ফিরে দিলে সে কবিরে।
গোপনে জাগালে সুরের বেদনা
বাজে বীণা যে গভীরে।
প্রিয়-হাত হতে পর পুষ্পের হার,
দয়িতের গলে কর তুমি আরবার :
দানের মাল্যদান।
নিজেরে সঁপিলে প্রিয়ের মূল্যে
করিয়া মূল্যবান।

১৯৩২ ?

আদিতম

কে আমার ভাষাহীন অন্তরে
চিত্তের মেঘলোকে সন্তরে,
বক্ষের কাছে থাকে তবুও সে রয় দূরে,
থাকে অশ্রুত সুরে।
ভাবি বসে, গাব আমি তারি গান,—
চুপ করে থাকি সারা দিনমান,
অকথিত আবেগের ব্যথা সই।
মন বলে, কথা কই, কথা কই।

চঞ্চল শোণিতে যে
সত্তার ক্রন্দন ধ্বনিতেছে
অর্থ কী জানি তাহা,
আদিতম আদিমের বাণী তাহা।
ভেদ করি ঝঞ্ঝার আলোড়ন
ছেদ করি বাষ্পের আবরণ
চুম্বিল ধরাতল যে আলোক,
স্বর্গের সে বালক
কানে তার বলে গেছে যে কথাটি
তারি স্মৃতি আজো ধরণীর মাটি
দিকে দিকে বিকাশিছে ঘাসে ঘাসে-
তারি পানে চেয়ে চেয়ে
সেই সুর কানে আসে।

প্রাণের প্রথমতম কম্পন
অশথের মজ্জায় করিতেছে বিচরণ,
তারি সেই ঝংকার ধ্বনিহীন—
আকাশের বক্ষেতে কেঁপে ওঠে নিশিদিন ;

মোর শিরাতন্তুতে বাজে তাই;
সুগভীর চেতনার মাঝে তাঁই
নর্তন জেগে ওঠে অদৃশ্য ভঙ্গীতে
অরণ্যমর্মর-সংগীতে।

ওই তরু ওই লতা ওরা সবে
মুখরিত কুসুমে ও পল্লবে—
সেই মহাবাণীময় গহন মৌনতলে
নির্বাক স্থলে জলে
শুনি আদি ওঙ্কার,
শুনি মূক গুঞ্জন অগোচর চেতনার।

ধরণীর ধূলি হতে তারার সীমার কাছে
কথাহারা যে ভুবন ব্যাপিয়াছে
তার মাঝে নিই স্থান,
চেয়ে-থাকা দুই চোখে বাজে ধ্বনিহীন গান।

৮ বৈশাখ, ১৩৪১
[শান্তিনিকেতন]

পাঠিকা

বহিছে হাওয়া উতল বেগে,
আকাশ ঢাকা সজল মেঘে,
ধ্বনিয়া উঠে কেকা।
করিনি কাজ, পরিনি বেশ,
গিয়েছে বেলা বাঁধিনি কেশ,
পড়ি তোমারি লেখা।

ওগো আমারি কবি,
তোমারে আমি জানিনে কভু,
তোমার বাণী আঁকিছে তবু
অলস মনে অজানা তব ছবি।
বাদলছায়া হায় গো মরি,
বেদনা দিয়ে তুলেছ ভরি,
নয়ন মম করিছে ছলোছলো।
হিয়ার মাঝে কী-কথা তুমি বল।

কোথায় কবে আছিলে জাগি,
বিরহ তব কাহার লাগি,
কোন্ সে তব প্রিয়া।
ইন্দ্র তুমি, তোমার শচী—
জানি তাহারে তুলেছ রচি
আপন মায়া দিয়া।

ওগো আমার কবি,
ছন্দ বুকে যতই বাজে
ততই সেই মুরতি-মাঝে
জানি না কেন আমারে আমি লভি

নারীহৃদয়-যমুনাতীরে
চিরদিনের সোহাগিনীরে
চিরকালের শুনাও স্তবগান।
বিনা কারণে দুলিয়া ওঠে প্রাণ

নাই বা তার শুনিনু নাম,
কভু তাহারে না দেখিলাম,
কিসের ক্ষতি তায়।
প্রিয়ারে তব যে নাহি জানে
জানে সে তারে তোমার গানে
আপন চেতনায়।

ওগো আমার কবি,
সুদূর তব ফাগুন-রাতি
রক্তে মোর উঠিল মাতি,
চিত্তে মোর উঠিছে পল্লবি।
জেনেছ যারে তাহারো মাঝে
অজানা যেই সে-ই বিরাজে,
আমি যে সেই অজানাদের দলে।
তোমার মালা এল আমার গলে।

বৃষ্টিভেজা যে ফুলহার
শ্রাবণসাঁঝে তব প্রিয়ার
বেণীটি ছিল ঘেরি,
গন্ধ তারি স্বপ্নসম
লাগিছে মনে, যেন সে মম
বিগত জনমেরি

ওগো আমার কবি,
জান না, তুমি মৃদু কী তানে
আমারি এই লতাবিতানে
শুনায়েছিলে করুণ ভৈরবী।
ঘটেনি যাহা আজ কপালে
ঘটেছে যেন সে কোন্ কালে,
আপনভোলা যেন তোমার গীতি
বহিছে তারি গভীর বিস্মৃতি।

বৈশাখ, ১৩৪১
[শান্তিনিকেতন]

ছায়াছবি

একটি দিন পড়িছে মনে মোর।
উষার নিল মুকুট কাড়ি
শ্রাবণ ঘনঘোর ;
বাদলবেলা বাজায়ে দিল তূরী,
প্রহরগুলি ঢাকিয়া মুখ
করিল আলো চুরি।
সকাল হতে অবিশ্রামে
ধারাপতনশব্দ নামে,
পরদা দিল টানি,
সংসারের নানা ধ্বনিরে
করিল একখানি।

প্রবল বরিষনে
পাংশু হল দিকের মুখ,
আকাশ যেন নিরুৎসুক,
নদীপারের নীলিমা ছায়
পাণ্ডু আবরণে।
কর্মদিন হারাল সীমা,
হারাল পরিমাণ,
বিনা কারণে ব্যথিত হিয়া
উঠিল গাহি গুঞ্জরিয়া
বিদ্যাপতি-রচিত সেই
ভরা-বাদর গান।

ছিলাম এই কুলায়ে বসি
আপন মন-গড়া,

হঠাৎ মনে পড়িল তবে
এখনি বুঝি সময় হবে,
ছাত্রীটিরে দিতে হবে যে পড়া।
থামায়ে গান চাহিনু পশ্চাতে;
ভীরু সে মেয়ে কখন এসে
নীরব পায়ে দুয়ার ঘেঁষে
দাঁড়িয়ে আছে খাতা ও বহি হাতে।

করিনু পাঠ শুরু।
কপোল তার ঈষৎ রাঙা,
গলাটি আজ কেমন ভাঙা,
বক্ষ বুঝি করিছে দুরু দুরু।
কেবলি যায় ভুলে,
অন্যমনে রয়েছে যেন
বইয়ের পাতা খুলে।
কহিনু তারে, আজকে পড়া থাক।
সে শুধু মুখে তুলিয়া আঁখি
চাহিল নির্বাক্‌।

তুচ্ছ এই ঘটনাটুকু,
ভাবিনি ফিরে তারে।
গিয়েছে তার ছায়ামুরতি
কালের খেয়াপারে।
স্তব্ধ আজি বাদলবেলা,
নদীতে নাহি ঢেউ,
অলসমনে বসিয়া আছি
ঘরেতে নেই কেউ।

হঠাৎ দেখি চিত্তপটে চেয়ে,
সেই যে ভীরু মেয়ে
মনের কোণে কখন গেছে আঁকি
অবর্ষিত অশ্রুভরা
ডাগর দুটি আঁখি।

৪ আষাঢ়, ১৩৪২
[চন্দননগর]

নিমন্ত্রণ

মনে পড়ে, যেন এককালে লিখিতাম
　　চিঠিতে তোমারে প্রেয়সী অথবা প্রিয়ে—
একালের দিনে শুধু বুঝি লেখে নাম,—
　　থাক সে কথায়, লিখি বিনা নাম দিয়ে।
তুমি দাবি কর কবিতা আমার কাছে
　　মিল মিলাইয়া দুরূহ ছন্দে লেখা,
আমার কাব্য তোমার দুয়ারে যাচে
　　নম্র চোখের কম্প্র কাজলরেখা।
সহজ ভাষায় কথাটা বলাই শ্রেয়,—
　　যে-কোনো ছুতায় চলে এসো মোর ডাকে,
সময় ফুরোলে আবার ফিরিয়া যেয়ো,
　　বোসো মুখোমুখি যদি অবসর থাকে।
গৌরবরন তোমার চরণমূলে
　　ফলসাবরন শাড়িটি ঘেরিবে ভালো;
বসনপ্রান্ত সীমন্তে রেখো তুলে,
　　কপোলপ্রান্তে সরু পাড় ঘন কালো।
একগুছি চুল বায়ু-উচ্ছ্বাসে কাঁপা
　　ললাটের ধারে থাকে যেন অশাসনে।
ডাহিন অলকে একটি দোলনচাঁপা
　　দুলিয়া উঠুক গ্রীবাভঙ্গীর সনে।
বৈকালে গাঁথা যূথীমুকুলের মালা
　　কণ্ঠের তাপে ফুটিয়া উঠিবে সাঁঝে;
দূরে থাকিতেই গোপনগন্ধ-ঢালা
　　সুখসংবাদ মেলিবে হৃদয়মাঝে।
এই সুযোগেতে একটুকু দিই খোঁটা—
　　আমারি দেওয়া সে ছোট্ট চুনির দুল,

রক্তে জমানো যেন অশ্রুর কোঁটা,
কতদিন সেটা পরিতে করেছ ভুল

আরেকটা কথা বলে রাখি এইখানে,
কাব্যে সে কথা হবে না মানানসই,
সুর দিয়ে সেটা গাহিব না কোনো গানে,—
তুচ্ছ শোনাবে, তবু সে তুচ্ছ কই।
একালে চলে না সোনার প্রদীপ আনা,
সোনার বীণাও নহে আয়ত্তগত।
বেতের ডালায় রেশমি-রুমাল-টানা
অরুণবরন আম এনো গোটাকত।
গন্ধ জাতীয় ভোজ্যও কিছু দিয়ো,
পদ্যে তাদের মিল খুঁজে পাওয়া দায়।
তা হোক, তবুও লেখকের তারা প্রিয়;
জেনো, বাসনার সেরা বাসা রসনায়।
ওই দেখো, ওটা আধুনিকতার ভূত
মুখেতে জোগায় স্থূলতার জয়ভাষা,
জানি, অমরার পথহারা কোনো দূত
জঠরগুহায় নাহি করে যাওয়া আসা।
তথাপি পষ্ট বলিতে নাহি তো দোষ
যে-কথা কবির গভীর মনের কথা—
উদরবিভাগে দৈহিক পরিতোষ
সঙ্গী জোটায় মানসিক মধুরতা।
শোভন হাতের সন্দেশ, পানতোয়া,
মাছমাংসের পোলাও ইত্যাদিও
যবে দেখা দেয় সেবামাধুর্যে-ছোঁওয়া
তখন সে হয় কী অনির্বচনীয়।

বুঝি অনুমানে, চোখে কৌতুক ঝলে ;
ভাবিছ বসিয়া সহাস-ওষ্ঠাধরা,
এ সমস্তই কবিতার কৌশলে
মৃদুসংকেতে মোটা ফরমাশ করা।
আচ্ছা, না-হয় ইঙ্গিত শুনে হেসো ;
বরদানে, দেবী, না-হয় হইবে বাম ;
খালি হাতে যদি আস তবে তাই এসো,
সে দুটি হাতেরও কিছু কম নহে দাম।

সেই কথা ভালো, তুমি চলে এসো একা,
বাতাসে তোমার আভাস যেন গো থাকে ;
স্তব্ধ প্রহরে দুজনে বিজনে দেখা,
সন্ধ্যাতারাটি শিরীষডালের ফাঁকে।
তারপরে যদি ফিরে যাও ধীরে ধীরে
ভুলে ফেলে যেয়ো তোমার যূথীর মালা ;
ইমন বাজিবে বক্ষের শিরে শিরে,
তারপরে হবে কাব্য লেখার পালা।
যত লিখে যাই ততই ভাবনা আসে,
লেফাফার 'পরে কার নাম দিতে হবে ;
মনে মনে ভাবি গভীর দীর্ঘশ্বাসে,
কোন্ দূর যুগে তারিখ ইহার কবে।

মনে ছবি আসে— ঝিকিমিকি বেলা হল,
বাগানের ঘাটে গা ধুয়েছ তাড়াতাড়ি ;
কচি মুখখানি, বয়স তখন ষোলো ;
তনু দেহখানি ঘেরিয়াছে ডুরে শাড়ি।
কুঙ্কুমফোঁটা ভুরুসংগমে কিবা,
শ্বেতকরবীর গুচ্ছ কর্ণমূলে ;

পিছন হইতে দেখিনু কোমল গ্রীবা
লোভন হয়েছে রেশমচিকন চুলে।
তাম্রথালায় গোড়ে মালাখানি গেঁথে
সিক্ত রুমালে যত্নে রেখেছ ঢাকি ;
ছায়া-হেলা ছাদে মাদুর দিয়েছ পেতে,
কার কথা ভেবে বসে আছ জানি না কি।
আজি এই চিঠি লিখেছে তো সেই কবি ;
গোধূলির ছায়া ঘনায় বিজন ঘরে,
দেয়ালে ঝুলিছে সেদিনের ছায়াছবি,—
শব্দটি নেই, ঘড়ি টিক্‌টিক্ করে।
ওই তো তোমার হিসাবের ছেঁড়া পাতা,
দেরাজের কোণে পড়ে আছে আধুলিটি।
কতদিন হল গিয়েছ ভাবিব না তা,
শুধু রচি বসে নিমন্ত্রণের চিঠি।
মনে আসে, তুমি পুব জানালার ধারে
পশমের গুটি কোলে নিয়ে আছ বসে ;
উৎসুক চোখে বুঝি আশা কর কারে,
আলগা আঁচল মাটিতে পড়েছে খসে।
অর্ধেক ছাদে রৌদ্র নেমেছে বেঁকে,
বাকি অর্ধেক ছায়াখানি দিয়ে ছাওয়া ;
পাঁচিলের গায়ে চীনের টবের থেকে
চামেলি ফুলের গন্ধ আনিছে হাওয়া।

এ চিঠির নেই জবাব দেবার দায়,
আপাতত এটা দেরাজে দিলেম রেখে।
পার যদি এসো শব্দবিহীন পায়,
চোখ টিপে ধোরো হঠাৎ পিছন থেকে।

আকাশে চুলের গন্ধটি দিয়ো পাতি,
এনো সচকিত কাঁকনের রিনিরিন,
আনিয়ো মধুর স্বপ্নসঘন রাতি,
আনিয়ো গভীর আলস্যঘন দিন।
তোমাতে আমাতে মিলিত নিবিড় একা—
স্থির আনন্দ, মৌন মাধুরীধারা,
মুগ্ধ প্রহর ভরিয়া তোমারে দেখা,
তব করতল মোর করতলে হারা।

১৪ জুন, ১৯৩৫
চন্দননগর

ছুটির লেখা

এ লেখা মোর শূন্যদ্বীপের সৈকততীর,
তাকিয়ে থাকে দৃষ্টি-অতীত পারের পানে।
উদ্দেশহীন জোয়ার-ভাঁটায় অস্থির নীর
শামুক ঝিনুক যা খুশি তাই ভাসিয়ে আনে।
এ লেখা নয় বিরাট সভার শ্রোতার লাগি,
রিক্ত ঘরে একলা এ যে দিন কাটাবার ;
আটপহুরে কাপড়টা তার ধুলায় দাগি,
বড়ো ঘরের নেমন্তন্নে নয় পাঠাবার।
বয়ঃসন্ধিকালের যেন বালিকাটি,
ভাব্‌নাগুলো উড়ো উড়ো আপনাভোলা।
অযতনের সঙ্গী তাহার ধুলোমাটি,
বাহির-পানে পথের দিকে দুয়ার খোলা।
আলস্যে তার পা ছড়ানো মেঝের উপর,
ললাটে তার রুক্ষ কেশের অবহেলা।
নাইক খেয়াল কখন সকাল পেরোয় দুপুর,
রেশমি ডানায় যায় চলে তার হালকা বেলা।
চিনতে যদি চাও তাহারে এসো তবে,
দ্বারের ফাঁকে দাঁড়িয়ে থেকো আমার পিছু।
সুধাও যদি প্রশ্ন কোনো তাকিয়ে রবে
বোকার মতন,— বলার কথা নেই যে কিছু।
ধুলায় লোটে রাঙাপাড়ের আঁচলখানা.
দুই চোখে তার নীল আকাশের সুদূর ছুটি ;
কানে কানে কে কথা কয় যায় না জানা,
মুখের ’পরে কে রাখে তার নয়নদুটি।
মর্মরিত শ্যামল বনের কাঁপন থেকে
চমকে নামে আলোর কণা আলগা চুলে ;

তাকিয়ে দেখে, নদীর রেখা চলছে বেঁকে—
দোয়েলডাকা ঝাউয়ের শাখা উঠছে দুলে।
সম্মুখে তার বাগানকোণায় কামিনী ফুল
আনন্দিত অপব্যয়ে পাপড়ি ছড়ায়।
বেড়ার ধারে বেগনিগুচ্ছে ফুল্ল জারুল
দখিন হাওয়ার সোহাগেতে শাখা নড়ায়।
তরুণ রৌদ্রে তপ্ত মাটির মৃদুশ্বাসে
তুল্‌সিঝোপের গন্ধটুকু ঢুকছে ঘরে।
খামখেয়ালি একটা ভ্রমর আশে পাশে
গুঞ্জরিয়া যায় উড়ে কোন্‌ বনান্তরে।
পাঠশালা সে ফাঁকি দিয়ে পালিয়ে এড়ায়,
শেখার মতো কোনো কিছুই হয়নি শেখা ;
আলোছায়ায় ছন্দ তাহার খেলিয়ে বেড়ায়
আলুথালু অবকাশের অবুঝ লেখা।
সবুজ সোনা নীলের মায়া ঘিরল তাকে ;
শুকনো ঘাসের গন্ধ আসে জানলা ঘুরে ;
পাতার শব্দে, জলের শব্দে, পাখির ডাকে
প্রহরটি তার আঁকাজোকা নানান সুরে।
সব নিয়ে যে দেখল তারে পায় সে দেখা,—
বিশ্বমাঝে ধুলার 'পরে অলজ্জিত,
নইলে সে তো মেঠো পথে নীরব একা
শিথিলবেশে অনাদরে অসজ্জিত।

৬ জুন, ১৯৩৫
চন্দননগর

নাট্যশেষ

১

দূর অতীতের পানে পশ্চাতে ফিরিয়া চাহিলাম ;
হেরিতেছি যাত্রী দলে দলে। জানি সবাকার নাম,
চিনি সকলেরে। আজ বুঝিয়াছি, পশ্চিম আলোতে
ছায়া ওরা। নটরূপে এসেছে নেপথ্যলোক হতে
দেহ-ছদ্মসাজে ; সংসারের ছায়ানাট্য অন্তহীন,
সেথায় আপন পাঠ আবৃত্তি করিয়া রাত্রিদিন
কাটাইল ; সূত্রধার অদৃষ্টের আভাসে আদেশে
চালাইল নিজ নিজ পালা, কভু কেঁদে কভু হেসে
নানা ভঙ্গী নানা ভাবে। শেষে অভিনয় হলে সারা
দেহবেশ ফেলে দিয়ে নেপথ্যে অদৃশ্যে হল হারা।

যে খেলা খেলিতে এল হয়তো কোথাও তার আছে
নাট্যগত অর্থ কোনোরূপ, বিশ্বমহাকবি-কাছে
প্রকাশিত। নটনটী রঙ্গসাজে ছিল যতক্ষণ
সত্য বলে জেনেছিল প্রত্যহের হাসি ও ক্রন্দন,
উত্থানপতন বেদনার। অবশেষে যবনিকা
নেমে গেল ; নিবে গেল একে একে প্রদীপের শিখা ;
ম্লান হল অঙ্গরাগ ; বিচিত্র চাঞ্চল্য গেল থেমে ;
যে নিস্তব্ধ অন্ধকারে রঙ্গমঞ্চ হতে গেল নেমে
স্তুতি নিন্দা সেথায় সমান, ভেদহীন মন্দ ভালো,
দুঃখসুখভঙ্গী অর্থহীন, তুল্য অন্ধকার আলো,
লুপ্ত লজ্জাভয়ের ব্যঞ্জনা। যুদ্ধে উদ্ধারিয়া সীতা
পরক্ষণে প্রিয়হস্ত রচিতে বসিল তার চিতা ;
সে পালার অবসানে নিঃশেষে হয়েছে নিরর্থক
সে দুঃসহ দুঃখদাহ— শুধু তারে কবির নাটক
কাব্যডোরে বাঁধিয়াছে, শুধু তারে ঘোষিতেছে গান,
শিল্পের কলায় শুধু রচে তাহা আনন্দের দান।

২

জনশূন্য ভাঙাঘাটে আজি বৃদ্ধ বটচ্ছায়াতলে
গোধূলির শেষ আলো আষাঢ়ে ধূসর নদীজলে
মগ্ন হল। ওপারের লোকালয় মরীচিকাসম
চক্ষে ভাসে। একা বসে দেখিতেছি মনে মনে, মম
দূর আপনার ছবি নাট্যের প্রথম অঙ্কভাগে
কালের লীলায়। সেদিনের সদ্য-জাগা চক্ষে জাগে
অস্পষ্ট কী প্রত্যাশার অরুণিম প্রথম উন্মেষ;
সম্মুখে সে চলেছিল, না জানিয়া শেষের উদ্দেশ,
নেপথ্যের প্রেরণায়। জানা না-জানার মধ্যসেতু
নিত্য পার হতেছিল কিছু তার না বুঝিয়া হেতু।
অকস্মাৎ পথমাঝে কে তারে ভেটিল একদিন,
দুই অজানার মাঝে দেশকাল হইল বিলীন
সীমাহীন নিমেষেই; পরিব্যাপ্ত হল জানাশোনা
জীবনের দিগন্ত পারায়ে। ছায়ায়-আলোয়-বোনা
আতপ্ত ফাল্গুনদিনে মর্মরিত চাঞ্চল্যের স্রোতে
কুঞ্জপথে মেলিল সে স্ফুরিত অঞ্চলতল হতে
কনকচাঁপার আভা। গন্ধে শিহরিয়া গেল হাওয়া
শিথিল কেশের স্পর্শে। দুজনে করিল আসাযাওয়া
অজানা অধীরতায়।

সহসা রাত্রে সে গেল চলি
যে-রাত্রি হয় না কভু ভোর। অদৃষ্টের যে-অঞ্জলি
এনেছিল সুধা, নিল ফিরে। সেই যুগ হল গত
চৈত্রশেষে অরণ্যের মাধবীর সুগন্ধের মতো।
তখন সেদিন ছিল সবচেয়ে সত্য এ ভুবনে,
সমস্ত বিশ্বের যন্ত্র বাঁধিত সে আপন বেদনে

আনন্দ ও বিষাদের সুরে। সেই সুখ দুঃখ তার
জোনাকির খেলা মাত্র, যারা সীমাহীন অন্ধকার
পূর্ণ করে চুমকির কাজে বিঁধে আলোকের সূচি ;
সে-রাত্রি অক্ষত থাকে, বিনা চিহ্নে আলো যায় ঘুচি
সে ভাঙা যুগের 'পরে কবিতার অরণ্যলতায়
ফুটিছে ছন্দের ফুল, দোলে তারা গানের কথায়।
সেদিন আজিকে ছবি হৃদয়ের অজন্তাগুহাতে
অন্ধকার ভিত্তিপটে ; ঐক্য তার বিশ্বশিল্প-সাথে।

[আষাঢ়, ১৩৪২
চন্দননগর]

বিহ্বলতা

অপরিচিতের দেখা বিকশিত ফুলের উৎসবে

পল্লবের সমারোহে।

মনে পড়ে, সেই আর কবে

দেখেছিনু শুধু ক্ষণকাল।

খর সূর্যকরতাপে

নিষ্ঠুর বৈশাখবেলা ধরণীরে রুদ্র অভিশাপে

বন্দী করেছিল তৃষ্ণাজালে।

শুষ্ক তরু,

ম্লান বন,

অবসন্ন পিককণ্ঠ,

শীর্ণচ্ছায়া অরণ্য নির্জন।

সেই তীব্র আলোকেতে দেখিলাম দীপ্ত মূর্তি তার—

জ্বালাময় আঁখি,

বর্ণচ্ছটাহীন বেশ,

নির্বিকার

মুখচ্ছবি।

বিরলপল্লব স্তব্ধ বনবীথি-’পরে

নিঃশব্দ মধ্যাহ্নবেলা দূর হতে মুক্তকণ্ঠ স্বরে

করেছি বন্দনা।

জানি, সে না-শোনা সুর গেছে ভেসে

শূন্যতলে।

সেও ভালো, তবু সে তো তাহারি উদ্দেশে

একদা অর্পিয়াছিনু স্পষ্টবাণী, সত্য নমস্কার,

অসংকোচে পূজা-অর্ঘ্য,

সেই জানি গৌরব আমার।

শ্রাবণে অপরাজিতা, চেয়ে দেখি তারে
আঁখি ডুবে যায় একেবারে—
ছোটো পত্রপুটে তার নীলিমা করেছে ভরপুর,
দিগন্তের শৈলতটে অরণ্যের সুর
বাজে তাহে, সেই দূর আকাশের বাণী
এনেছে আমার চিত্তে তোমার নির্বাক্ মুখখানি

২৯ জুলাই, ১৯৩২

পোড়ো বাড়ি

সেদিন তোমার মোহ লেগে
আনন্দের বেদনায় চিত্ত ছিল জেগে ;
প্রতিদিন প্রভাতে পড়িত মনে, —
তুমি আছ এ ভুবনে।
পুকুরে বাঁধানো ঘাটে স্নিগ্ধ অশথের মূলে
বসে আছ এলোচুলে,
আলোছায়া পড়েছে আঁচলে তব—
প্রতিদিন মোর কাছে এ যেন সংবাদ অভিনব।
তোমার শয়নঘরে ফুলদানি,
সকালে দিতাম আনি
নাগকেশরের পুষ্পভার
অলক্ষ্যে তোমার।
প্রতিদিন দেখা হত, তবু কোনো ছলে
চিঠি রেখে আসিতাম বালিশের তলে।
সেদিনের আকাশেতে তোমার নয়ন দুটি কালো
আলোরে করিত আরো আলো।
সেদিনের বাতাসেতে তোমার সুগন্ধ কেশপাশ
নন্দনের আনিত নিশ্বাস।

অনেক বৎসর গেল, দিন গণি নহে তার মাপ,—
তারে জীর্ণ করিয়াছে ব্যর্থতার তীব্র পরিতাপ।
নির্মম ভাগ্যের হাতে লেখা
বঞ্চনার কালো কালো রেখা
বিকৃত স্মৃতির পটে নিরর্থক করেছে ছবিরে।
আলোহীন গানহীন হৃদয়ের গহন গভীরে
সেদিনের কথাগুলি
দুর্লক্ষণ বাদুড়ের মতো আছে ঝুলি।

আজ যদি তুমি এস কোথা তব ঠাঁই,
সে তুমি তো নাই।
আজিকার দিন
তোমারে এড়ায়ে যাবে পরিচয়হীন।
তোমার সেকাল আজি ভাঙাচোরা যেন পোড়ো বাড়ি
লক্ষ্মী যারে গেছে ছাড়ি;
ভূতে-পাওয়া ঘর
ভিত জুড়ে আছে যেথা দেহহীন ডর।
আগাছায় পথ রুদ্ধ, আঙিনায় মনসার ঝোপ,
তুলসীর মঞ্চখানি হয়ে গেছে লোপ।
বিনাশের গন্ধ ওঠে, দুর্গ্রহের শাপ,
দুঃস্বপ্নের নিঃশব্দ বিলাপ।

৩ অগস্ট, ১৯৩২

মৌন

কেন চুপ করে আছি, কেন কথা নাই,
শুধাইছ তাই।
কথা দিয়ে ডেকে আনি যারে
দেবতারে,
বাহির দ্বারের কাছে এসে
ফিরি যায় হেসে।
মৌনের বিপুল শক্তিপাশে
ধরা দিয়ে আপনি যে আসে
আসে পরিপূর্ণতায়
হৃদয়ের গভীর গুহায়।

অধীর আহ্বানে রবাহূত
প্রসাদের মূল্য হয় চ্যুত।
স্বর্গ হতে বর, সেও আনে অসম্মান
ভিক্ষার সমান।
ক্ষুব্ধ বাণী যবে শান্ত হয়ে আসে
দৈববাণী নামে সেই অবকাশে।
নীরব আমার পূজা তাই,
স্তবগান নাই;
আর্দ্র স্বরে উর্ধ্ব-পানে চেয়ে নাহি ডাকে,
স্তব্ধ হয়ে থাকে।

হিমাদ্রিশিখরে নিত্যনীরবতা তার
ব্যাপ্ত করি রহে চারিধার;
নির্লিপ্ত সে সুদূরতা বাক্যহীন বিশাল আহ্বান
আকাশে আকাশে দেয় টান,

মেঘপুঞ্জ কোথা থেকে
অবারিত অভিষেকে
অজস্র সহস্রধারে
পুণ্য করে তারে।
না-কওয়ার না-চাওয়ার সেই সাধনায় হয়ে লীন
সার্থক শান্তিতে যাক দিন।

১৮।১।৩৪

ভুল

সহসা তুমি করেছ ভুল গানে
বেধেছে লয় তানে,
স্খলিত পদে হয়েছে তাল ভাঙা—
শরমে তাই মলিন মুখ নত,
দাঁড়ালে থতমতো,
তাপিত দুটি কপোল হল রাঙা।
নয়নকোণ করিছে ছলোছলো
শুধালে তবু কথা কিছু না বল,
অধর থরো থরো,
আবেগভরে বুকের ’পরে মালাটি চেপে ধর।

অবমানিতা, জান না তুমি নিজে
মাধুরী এল কী যে
বেদনাভরা ত্রুটির মাঝখানে।
নিখুঁত শোভা নিরতিশয় তেজে
অপরাজেয় সে যে
পূর্ণ নিজে নিজেরই সম্মানে।
একটুখানি দোষের ফাঁক দিয়ে
হৃদয়ে আজি নিয়ে এসেছ, প্রিয়ে,
করুণ পরিচয়—
শরৎপ্রাতে আলোর সাথে ছায়ার পরিণয়।

তৃষিত হয়ে ওইটুকুরই লাগি
আছিল মন জাগি,
বুঝিতে তাহা পারিনি এতদিন।
গৌরবের গিরিশিখর-’পরে
ছিলে যে সমাদরে
তুষারসম শুভ্র সুকঠিন।

নামিলে নিয়ে অশ্রুজলধারা
ধূসর ম্লান আপন-মান-হারা
আমারো ক্ষমা চাহি—
তখনি জানি আমারি তুমি, নাহি গো দ্বিধা নাহি

এখন আমি পেয়েছি অধিকার
তোমার বেদনার
অংশ নিতে আমার বেদনায়।
আজিকে সব ব্যাঘাত টুটে
জীবনে মোর উঠিল ফুটে
শরম তব পরম করুণায়।
অকুণ্ঠিত দিনের আলো
টেনেছে মুখে ঘোমটা কালো ;
আমার সাধনাতে
এল তোমার প্রদোষবেলা সাঁঝের তারা হাতে

৬ বৈশাখ, ১৩৪১

ব্যর্থ মিলন

বুঝিলাম, এ মিলন ঝড়ের মিলন,
কাছে এনে দূরে দিল ঠেলি।
ক্ষুব্ধ মন
যতই ধরিতে চায়, বিরুদ্ধ আঘাতে
তোমারে হারায় হতাশ্বাস।
তব হাতে
দাক্ষিণ্য যে নাই, শুধু শিথিল পরশে
করিছে কৃপণ কৃপা। কর্তব্যের বশে
যে-দান করিলে তার মূল্য অপহরি
লুকায়ে রাখিলে কোথা,
আমি খুঁজে মরি
পাইনে নাগাল। শরতের মেঘ তুমি
ছায়া মাত্র দিয়ে ভেসে যাও,
মরুভূমি
শূন্য-পানে চেয়ে থাকে, পিপাসা তাহার
সমস্ত হৃদয় ব্যাপি করে হাহাকার।

ভয় করিয়ো না মোরে।
এ করুণাকণা
রেখো মনে— ভুল করে মনে করিয়ো না
দস্যু আমি, লোভেতে নিষ্ঠুর।
জেনো মোরে
প্রেমের তাপস।
সুকঠোর ব্রত ধরে
করিব সাধনা,

আশাহীন ক্ষোভহীন
বহ্নিতপ্ত ধ্যানাসনে রব রাত্রিদিন।
—ছাড়িয়া দিলাম হাত।
যদি কভু হয়
তপস্যা সার্থক, তবে পাইব হৃদয়।
না-ও যদি ঘটে, তবে আশাচঞ্চলতা
দাহিয়া হইবে শান্ত। সেও সফলতা।

১৩৩৮ ?

অপরাধিনী

অপরাধ যদি ক'রে থাক
কেন ঢাক
মিথ্যা মোর কাছে।
শাসনের দণ্ড সে কি এই হাতে আছে
যে-হাতে তোমার কণ্ঠে পরায়েছি বরণের হার।
শাস্তি এ আমার।
ভাগ্যেরে করেছি জয়
এ বিশ্বাসে মনে মনে ছিলাম নির্ভয়।
আলস্যে কি ভেবেছিনু তাই—
সাধনার আয়োজনে আর মোর প্রয়োজন নাই।

রুষ্ট ভাগ্য ভেঙে দিল অহংকার।
'যা ঘটিল তাই আমি করিনু স্বীকার।
ক্ষমা করো মোরে।
আপনারে রেখেছিনু কারাগার ক'রে
তোমারে ঘিরিয়া,
পীড়িয়াছি ফিরিয়া ফিরিয়া
দিনে রাতে।
কখনো অজ্ঞাতে
যেখানে বেদনা তব সেখানে দিয়েছি মোর ভার।
বিষম দুঃসহ বোঝা এ ভালোবাসার
সেখানে দিয়েছি চেপে ভালোবাসা নেই যেখানেতে।
বসেছি আসন পেতে
যেখানে স্থানের টানাটানি।

হায় জানি
কী ব্যথা কঠোর।
এ প্রেমের কারাগারে মোর
যন্ত্রণায় জাগি
সুরঙ্গ কেটেছ যদি পরিত্রাণ লাগি
দোষ দিব কারে।
শান্তি তো পেয়েছ তুমি এতদিন সেই রুদ্ধদ্বারে।
সে শান্তির হোক অবসান।
আজ হতে মোর শাস্তি শুরু হবে, বিধির বিধান।

[২ ফাল্গুন, ১৩৩৮]

বিচ্ছেদ

তোমাদের দুজনের মাঝে আছে কল্পনার বাধা ;
হল না সহজ পথ বাঁধা
স্বপ্নের গহনে।
মনে মনে
ডাক দাও পরস্পরে সঙ্গহীন কত দিনে রাতে ;
তবু ঘটিল না কোন্ সামান্য ব্যাঘাতে
মুখোমুখি দেখা।
দুজনে রহিলে একা
কাছে কাছে থেকে ;
তুচ্ছ, তবু অলঙ্ঘ্য সে দোঁহারে রহিল যাহা ঢেকে

বিচ্ছেদের অবকাশ হতে
বায়ুস্রোতে
ভেসে আসে মধুমঞ্জরীর গন্ধশ্বাস ;
চৈত্রের আকাশ
রৌদ্রে দেয় বৈরাগির বিভাসের তান ;
আসে দোয়েলের গান ;
দিগন্তরে পথিকের বাঁশি যায় শোনা।
উভয়ের আনাগোনা
আভাসেতে দেখা যায় ক্ষণে ক্ষণে
চকিত নয়নে।
পদধ্বনি শোনা যায়
শুষ্কপত্রপরিকীর্ণ বনবীথিকায়।

তোমাদের ভাগ্য আছে চেয়ে অনুক্ষণ
কখন দোঁহার মাঝে একজন

উঠিবে সাহস ক'রে,
বলিবে, "যে মায়াডোরে
বন্দী হয়ে দূরে ছিনু এতদিন
ছিন্ন হোক, সে তো সত্যহীন।
লও বক্ষে দুবাহু বাড়ায়ে;
সম্মুখে যাহারে চাও পিছনেই আছে সে দাঁড়ায়ে।"

১৬ জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪০
দার্জিলি

বিদ্রোহী

পর্বতের অন্য প্রান্তে ঝর্ঝরিয়া ঝরে রাত্রিদিন
নির্ঝরিণী ;
এ মরুপ্রান্তের তৃষ্ণা হল শান্তিহীন
পলাতকা মাধুর্যের কলস্বরে।
শুধু ওই ধ্বনি
তৃষিত চিত্তের যেন বিদ্যুতে খচিত বজ্রমণি
বেদনায় দোলে বক্ষে।
কৌতুকচ্ছুরিত হাস্য তার
মর্মের শিরায় মোর তীব্রবেগে করিছে বিস্তার
জ্বালাময় নৃত্যস্রোত।
ওই ধ্বনি আমার স্বপন
চঞ্চলিতে চাহে তার বঞ্চনায়।
মূঢ়ের মতন
ভুলিব না তাহে কভু।
জানিব মানিব নিঃসংশয়,
দুর্লভেরে মিলিবে না ;
করিব কঠোর বীর্যে জয়
ব্যর্থ দুরাশারে মোর।
চিরজন্ম দিব অভিশাপ
দয়ারিক্ত দুর্গমেরে।
আশাহারা বিচ্ছেদের তাপ ;
দুঃসহ দাহনে তার দীপ্ত করি হানিব বিদ্রোহ
অকিঞ্চন অদৃষ্টেরে।
পুষিব না ভিক্ষুকের মোহ।

৩ জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪২
চন্দননগর

গীতচ্ছবি

তুমি যবে গান কর অলৌকিক গীতমূর্তি তব
ছাড়ি তব অঙ্গসীমা আমার অন্তরে অভিনব
ধরে রূপ, যজ্ঞ হতে উঠে আসে যেন যাজ্ঞসেনী—
ললাটে সন্ধ্যার তারা, পিঠে জ্যোতিবিজড়িত বেণী,
চোখে নন্দনের স্বপ্ন, অধরের কথাহীন ভাষা
মিলায় গগনে মৌন নীলিমায়, কী সুধাপিপাসা
অমরার মরীচিকা রচে তব তনুদেহ ঘিরে।
অনাদিবীণায় বাজে যে-রাগিণী গভীরে গম্ভীরে
সৃষ্টিতে প্রস্ফুটি উঠে পুষ্পে পুষ্পে, তারায় তারায়,
উত্তুঙ্গ পর্বতশৃঙ্গে, নির্ঝরের দুর্দম ধারায়,
জন্মমরণের দোলে ছন্দ দেয় হাসিক্রন্দনের
সে অনাদি সুর নামে তব সুরে, দেহবন্ধনের
পাশ দেয় মুক্ত করি, বাধাহীন চৈতন্য এ মম
নিঃশব্দে প্রবেশ করে নিখিলের সে অন্তরতম
প্রাণের রহস্যলোকে— যেখানে বিদ্যুৎ-সূক্ষ্মছায়া
করিছে রূপের খেলা, পরিতেছে ক্ষণিকের কায়া,
আবার ত্যজিয়া দেহ ধরিতেছে মানসী আকৃতি—
সেই তো কবির কাব্য, সেই তো তোমার কণ্ঠে গীতি

৫ জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪২

চন্দননগর

ছবি

একলা ব'সে, হেরো, তোমার ছবি
এঁকেছি আজ বসন্তী রঙ দিয়া।
খোঁপার ফুলে একটি মধুলোভী
মৌমাছি ওই গুঞ্জরে বন্দিয়া।
সমুখ-পানে বালুতটের তলে
শীর্ণ নদী শান্ত ধারায় চলে,
বেণুচ্ছায়া তোমার চেলাঞ্চলে
উঠিছে স্পন্দিয়া।

মগ্ন তোমার স্নিগ্ধ নয়ন দুটি
ছায়ায় ছন্ন অরণ্য-অঙ্গনে
প্রজাপতির দল যেখানে জুটি
রঙ ছড়াল প্রফুল্ল রঙ্গনে।
তপ্ত হাওয়ায় শিথিলমঞ্জরি
গোলকচাঁপা একটি দুটি করি
পায়ের কাছে পড়ছে ঝরি ঝরি
তোমারে নন্দিয়া।

ঘাটের ধারে কম্পিত ঝাউশাখে
দোয়েল দোলে সংগীতে চঞ্চলি।
আকাশ ঢালে পাতার ফাঁকে ফাঁকে
তোমার কোলে সুবর্ণ-অঞ্জলি।
বনের পথে কে যায় চলি দূরে,
বাঁশির ব্যথা পিছনফেরা সুরে
তোমায় ঘিরে হাওয়ায় ঘুরে ঘুরে
ফিরিছে ক্রন্দিয়া।

১৭ বৈশাখ, ১৩৩৮

প্রণতি

প্রণাম আমি পাঠানু গানে
উদয়গিরিশিখর-পানে
অস্তমহাসাগর তট হতে—
নবজীবনযাত্রাকালে
সেখান হতে লেগেছে ভালে
আশিসখানি অরুণ-আলোস্রোতে।
প্রথম সেই প্রভাত-দিনে
পড়েছি বাঁধা ধরার ঋণে,
কিছু কি তার দিয়েছি শোধ করি।
চিররাতের তোরণে থেকে
বিদায়বাণী গেলেম রেখে
নানা রঙের বাষ্পলিপি ভরি।

বেসেছি ভালো এই ধরারে,
মুগ্ধ চোখে দেখেছি তারে,
ফুলের দিনে দিয়েছি রচি গান;
সে গানে মোর জড়ানো প্রীতি,
সে গানে মোর রহুক স্মৃতি,
আর যা আছে হউক অবসান।
রোদের বেলা ছায়ার বেলা
করেছি সুখদুখের খেলা,
সে খেলাঘর মিলাবে মায়াসম;
অনেক তৃষা, অনেক ক্ষুধা,
তাহারি মাঝে পেয়েছি সুধা,—
উদয়গিরি প্রণাম লহো মম।

বরষ আসে বরষশেষে,
প্রবাহে তারি যায় রে ভেসে
বাঁধিতে যারে চেয়েছি চিরতরে।
বারে বারেই ঋতুর ডালি
পূর্ণ হয়ে হয়েছে খালি
মমতাহীন সৃষ্টিলীলাভরে।
এ মোর দেহ-পেয়ালাখানা
উঠেছে ভরি কানায় কানা
রঙিন রসধারায় অনুপম।
একটুকুও দয়া না মানি
ফেলায়ে দেবে, জানি তা জানি,—
উদয়গিরি তবুও নমোনম।

কখনো তার গিয়েছে ছিঁড়ে,
কখনো নানা সুরের ভিড়ে
রাগিণী মোর পড়েছে আধো চাপা।
ফাল্গুনের আমন্ত্রণে
জেগেছে কুঁড়ি গভীর বনে,
পড়েছে ঝরি চৈত্রবায়ে-কাঁপা।
অনেক দিনে অনেক দিয়ে
ভেঙেছে কত গড়িতে গিয়ে,
ভাঙন হল চরম, প্রিয়তম;
সাজাতে পূজা করিনি ত্রুটি,
ব্যর্থ হলে নিলেম ছুটি,—
উদয়গিরি প্রণাম লহো মম।

[৭-১০ এপ্রিল, ১৯৩৪]

উদাসীন

তোমারে ডাকিনু যবে কুঞ্জবনে
তখনো আমের বনে গন্ধ ছিল।
জানি না কী লাগি ছিলে অন্যমনে,
তোমার দুয়ার কেন বন্ধ ছিল।
একদিন শাখা ভরি এল ফলগুচ্ছ,
ভরা অঞ্জলি মোর করি গেল তুচ্ছ,
পূর্ণতা-পানে আঁখি অন্ধ ছিল।

বৈশাখে অকরুণ দারুণ ঝড়ে
সোনাব বরন ফল খসিযা পড়ে ;
কহিনু "ধুলায় লোটে মোর যত অর্ঘ্য,
তব করতলে যেন পায় তার স্বর্গ।"
হায় রে, তখনো মনে দ্বন্দ্ব ছিল।

তোমার সন্ধ্যা ছিল প্রদীপহীনা,
আঁধারে দুয়ারে তব বাজানু বীণা।
তারার আলোক-সাথে মিলি মোর চিত্ত
ঝংকৃত তারে তারে করেছিল নৃত্য,
তোমার হৃদয় নিস্পন্দ ছিল।

তন্দ্রাবিহীন নীড়ে ব্যাকুল পাখি
হারায়ে কাহারে বৃথা মরিল ডাকি।
প্রহর অতীত হল, কেটে গেল লগ্ন,
একা ঘরে তুমি ঔদাস্যে নিমগ্ন,
তখনো দিগঞ্চলে চন্দ্র ছিল।

কে বোঝে কাহার মন! অবোধ হিয়া
দিতে চেয়েছিল বাণী নিঃশেষিয়া।
আশা ছিল, কিছু বুঝি আছে অতিরিক্ত
অতীতের স্মৃতিখানি অশ্রুতে সিক্ত,
বুঝিবা নূপুরে কিছু ছন্দ ছিল।

উষার চরণতলে মলিন শশী
রজনীর হার হতে পড়িল খসি।
বীণার বিলাপ কিছু দিয়েছে কি সঙ্গ,
নিদ্রার তটতলে তুলেছে তরঙ্গ,
স্বপ্নেও কিছু কি আনন্দ ছিল।

৯ শ্রাবণ, ১৩৪১
শান্তিনিকেতন

দানমহিমা

নির্ঝরিণী অকারণ অবারণ সুখে
নীরসেরে ঠেলা দিয়ে চলে তৃষিতের অভিমুখে,—
নিত্য অফুরান
আপনারে করে দান।
সরোবর প্রশান্ত নিশ্চল,
বাহিরেতে নিস্তরঙ্গ, অন্তরেতে নিস্তব্ধ নিস্তল।
চির-অতিথির মতো মহাবট আছে তীরে;
ভূরিপায়ী মূল তার অদৃশ্য গভীরে
অনিঃশেষ রস করে পান,
অজস্র পল্লবে তার করে স্তবগান।

তোমারে তেমনি দেখি নির্বিকল
অপ্রমত্ত পূর্ণতায়, হে প্রেয়সী, আছ অচঞ্চল।
তুমি কর বরদান দেবীসম ধীর আবির্ভাবে
নিরাসক্ত দাক্ষিণ্যের গম্ভীর প্রভাবে।
তোমার সামীপ্য সেই
নিত্য চারিদিকে আকাশেই
প্রকাশিত আত্মমহিমায়
প্রশান্ত প্রভায়।
তুমি আছ কাছে,
সে আত্মবিস্মৃত কৃপা,— চিত্ত তাহে পরিতৃপ্ত আছে
ঐশ্বর্যরহস্য যাহা তোমাতে বিরাজে
একই কালে ধন সেই, দান সেই, ভেদ নেই মাঝে।

৪ অগস্ট, ১৯৩২

ঈষৎ দয়া

চক্ষে তোমার কিছু বা করুণা ভাসে,
ওষ্ঠ তোমার কিছু কৌতুকে হাসে,
মৌনে তোমার কিছু লাগে মৃদু সুর।
আলো-আঁধারের বন্ধনে আমি বাধা,
আশানিরাশায় হৃদয়ে নিত্য ধাঁধা,
সঙ্গ যা পাই তারি মাঝে রহে দুর।

নির্মম হতে কুণ্ঠিত হও মনে ;
অনুকম্পার কিঞ্চিৎ কম্পনে
ক্ষণিকের তরে ছলকে কণিক সুধা।
ভাণ্ডার হতে কিছু এনে দাও খুঁজি,
অন্তরে তাহা ফিরাইয়া লও বুঝি,
বাহিরের ভোজে হৃদয়ে গুমরে ক্ষুধা।

ওগো মল্লিকা, তব ফাল্গুনরাতি
অজস্র দানে আপনি উঠে যে মাতি,
সে দাক্ষিণ্য দক্ষিণবায়ু-তরে।
তার সম্পদ সারা অরণ্য ভরি,—
গন্ধের ভারে মন্থর উত্তরী
কুঞ্জে কুঞ্জে লুণ্ঠিত ধূলি-'পরে।

উত্তরবায়ু আমি ভিক্ষুকসম
হিমনিশ্বাসে জানাই মিনতি মম
শুষ্ক শাখার বীথিকারে চঞ্চলি।
অকিঞ্চনের রোদনে ধেয়ান টুটে,
কৃপণ দয়ায় ক্বচিৎ একটি ফুটে
অবগুণ্ঠিত অকাল পুষ্পকলি।

যত মনে ভাবি, রাখি তারে সঞ্চিয়া,
ছিঁড়িয়া কাড়িয়া লয় মোরে বঞ্চিয়া
প্রলয়প্রবাহে ঝ'রে-পড়া যত পাতা।
বিস্ময় লাগে আশাতীত সেই দানে,
ক্ষীণ সৌরভে ক্ষণ গৌরব আনে।
বরণমাল্য হয় না তাহাতে গাঁথা।

১০।১।৩৪

ক্ষণিক

চৈত্রের রাতে যে মাধবীমঞ্জরী
ঝরে গেল, তারে কেন লও সাজি ভরি।
সে শুধিছে তার ধুলার চরম দেনা,
আজ বাদে কাল যাবে না তো তারে চেনা।
মরুপথে যেতে পিপাসার সম্বল
গাগরি হইতে চলকিয়া পড়ে জল,
সে জলে বালুতে ফল কি ফলাতে পার।
সে জলে কি তাপ মিটিবে কখনো কারো।
যাহা দেওয়া নহে, যাহা শুধু অপচয়,
তারে নিতে গেলে নেওয়া অনর্থ হয়।
ক্ষতির ধনেরে ক্ষয় হতে দেওয়া ভালো,
কুড়াতে কুড়াতে শুকায়ে সে হয় কালো।
হায় গো ভাগ্য, ক্ষণিক করুণাভরে
যে হাসি যে ভাষা ছড়ায়েছ অনাদরে,
বক্ষে তাহারে সঞ্চয় করে রাখি,
ধুলা ছাড়া তার কিছুই রয় না বাকি।
নিমেষে নিমেষে ফুরায় যাহার দিন
চিরকাল কেন বহিব তাহার ঋণ।
যাহা ভুলিবার তাহা নহে তুলিবার,
স্বপ্নের ফুলে কে গাঁথে গলার হার।
প্রতি পলকের নানা দেনাপাওনায়
চলতি মেঘের রঙ বুলাইয়া যায়
জীবনের স্রোতে ; চলতরঙ্গতলে
ছায়ার লেখন আঁকিয়া মুছিয়া চলে
শিল্পের মায়া,— নির্মম তার তুলি
আপনার ধন আপনি সে যায় ভুলি।

বিস্মৃতিপটে চিরবিচিত্র ছবি
লিখিয়া চলেছে ছায়া-আঁলোকের কবি।
হাসিকান্নার নিত্য ভাসান-খেলা
বহিয়া চলেছে বিধাতার অবহেলা।
নহে সে কৃপণ, রাখিতে যতন নাই,
খেলাপথে তার বিঘ্ন জমে না তাই।
মানো সেই লীলা, যাহা যায় যাহা আসে
পথ ছাড়ো তারে অকাতরে অনায়াসে।
আছে তবু নাই, তাই নাহি তার ভার ;
ছেড়ে যেতে হবে, তাই তো মূল্য তার।
স্বর্গ হইতে যে সুধা নিত্য ঝরে
সে শুধু পথের, নহে সে ঘরের তরে।
তুমি ভরি লবে ক্ষণিকের অঞ্জলি,
স্রোতের প্রবাহ চিরদিন যাবে চলি।

২৬ সেপ্টেম্বর, ১৯৩৪

রূপকার

ওরা কি কিছু বোঝে
যাহারা আনাগোনার পথে
ফেরে কত কী খোঁজে।
হেলায় ওরা দেখিয়া যায় এসে বাহির দ্বারে;
জীবনপ্রতিমারে
জীবন দিয়ে গড়িছে গুণী, স্বপন দিয়ে নহে।
ওরা তো কথা কহে,
সে-সব কথা মূল্যবান জানি,
তবু সে নহে বাণী।

রাতের পরে কেটেছে দুখরাত,
দিনের পরে দিন,
দারুণ তাপে করেছে তনু ক্ষীণ।
সৃষ্টিকারী বজ্রপাণি যে-বিধি নির্মম,
বহ্নিতুলিসম
কল্পনা সে দখিন হাতে যার,
সব-খোয়ানো দীক্ষা তারি নিঠুর সাধনার
নিয়েছে ও যে প্রাণে;
নিজেরে ও কি বাঁচাতে কভু জানে।

হায় রে রূপকার,
না-হয় কারো কর'নি উপকার,—
আপন দায়ে করেছ তুমি নিজেরে অবসান,
সে লাগি কভু চেয়ো না প্রতিদান।
পাঁজরভাঙা কঠিন বেদনার
অংশ নেবে শকতি হেন, বাসনা হেন কার।

বিধাতা যবে এসেছে দ্বারে গিয়েছে কর হানি,
জাগেনি তবু, শোনেনি ডাক যারা,
সে প্রেম তারা কেমনে দিবে আনি
যে প্রেম সবহারা—
করুণ চোখে যে প্রেম দেখে ভুল,
সকল ত্রুটি জানে,
তবু যে অনুকূল,
শ্রদ্ধা যার তবু না হার মানে।
কখনো যারা দেয়নি হাতে হাত,
মর্ম্মমাঝে করেনি আঁখিপাত,
প্রবল প্রেরণায়
দিল না আপনায়,
তাহারা কহে কথা,
ছড়ায় পথে বাধা ও বিফলতা,
করে না ক্ষমা কভু,
তুমি তাদের ক্ষমা করিয়ো তবু।

হায় গো রূপকার,
ভরিয়া দিয়ো জীবন-উপহার ;
চুকিয়ে দিয়ো তোমার দেয়,
রিক্তহাতে চলিয়া যেয়ো,
কোরো না দাবি ফলের অধিকার।
জানিয়ো মনে, চিরজীবন সহায়হীন কাজে
একটি সাথি আছেন হিয়ামাঝে ;
তাপস তিনি, তিনিও সদা একা,
তাঁহার কাজ ধ্যানের রূপ বাহিরে মেলে দেখা ॥

১০ এপ্রিল, ১৯৩৪

মেঘমালা

আসে অবগুণ্ঠিতা প্রভাতের অরুণ দুকূলে
শৈলতটমূলে
আত্মদান অর্ঘ্য আনে পায় ;
তপস্বীর ধ্যান ভেঙে যায়,
গিরিরাজ কঠোরতা যায় ভুলি,
চরণের প্রান্ত হতে বক্ষে লয় তুলি
সজল তরুণ মেঘমালা।
কল্যাণে ভরিয়া উঠে মিলনের পালা।
অচলে চঞ্চলে লীলা,
সুকঠিন শিলা
মত্ত হয় রসে।
উদার দাক্ষিণ্য তার বিগলিত নির্ঝরে বরষে,
গায় কলোচ্ছল গান।
সে দাক্ষিণ্য গোপনের দান
এ মেঘমালারি।

এ বর্ষণ তারি
পর্বতের বাণী হয়ে উঠে জেগে
নৃত্যবন্যাবেগে
বাধাবিঘ্ন চূর্ণ করে
তরঙ্গের নৃত্যসাথে যুক্ত হয় অনন্ত সাগরে।
নির্মমের তপস্যা টুটিয়া
চলিল ছুটিয়া
দেশে দেশে প্রাণের প্রবাহ,
জয়ের উৎসাহ ;

শ্যামলের মঙ্গল-উৎসবে
আকাশে বাজিল বীণা অনাহত রবে।
লঘুসুকুমার স্পর্শ ধীরে ধীরে
রুদ্রসন্ন্যাসীর স্তব্ধ নিরুদ্ধ শক্তিরে
দিল ছাড়া ; সৌন্দর্যের বীর্যবলে
স্বর্গেরে করিয়া জয় মুক্ত করি দিল ধরাতলে

৫ অগস্ট, ১৯৩৫
শান্তিনিকেতন

প্রাণের ডাক

সুদূর আকাশে ওড়ে চিল,
উড়ে ফেরে কাক,
বারে বারে ভোরের কোকিল
ঘন দেয় ডাক।
জলাশয় কোন্ গ্রামপারে,
বক উড়ে যায় তারি ধারে
ডাকাডাকি করে শালিখেরা।
প্রয়োজন থাক্ নাই থাক্
যে যাহারে খুশি দেয় ডাক,
যেথাসেথা করে চলাফেরা।

উছল প্রাণের চঞ্চলতা
আপনারে নিয়ে।
অস্তিত্বের আনন্দ ও ব্যথা
উঠিছে ফেনিয়ে।
জোয়ার লেগেছে জাগরণে—
কলোল্লাস তাই অকারণে,
মুখরতা তাই দিকে দিকে।
ঘাসে ঘাসে পাতায় পাতায়
কী মদিরা গোপনে মাতায়,
অধীরা করেছে ধরণীকে।

নিভৃতে পৃথক কোরো নাকো
তুমি আপনারে।
ভাবনার বেড়া বেঁধে রাখ
কেন চারিধারে।

প্রাণের উল্লাস অহেতুক
রক্তে তব হোক-না উৎসুক,
খুলে রাখো অনিমেষ চোখ ;
ফেলো জাল চারিদিক ঘিরে,
যাহা পাও টেনে লও তীরে
ঝিনুক শামুক যাই হোক।

হয়তো বা কোনো কাজ নাই,
ওঠো তবু ওঠো ;
বৃথা হোক তবুও বৃথাই
পথ-পানে ছোটো।
মাটির হৃদয়খানি ব্যেপে
প্রাণের কাঁপন ওঠে কেঁপে,
কেবল পরশ তার লহো।
আজি এই চৈত্রের প্রভাতে
আছ তুমি সকলের সাথে,
এ কথাটি মনে প্রাণে কহো।

৭ এপ্রিল, ১৯৩৪
জোড়াসাঁকো

দেবদারু

দেবদারু, তুমি মহাবাণী
দিয়েছ মৌনের বক্ষে প্রাণমন্ত্র আনি—
যে প্রাণ নিস্তব্ধ ছিল মরুদুর্গতলে
প্রস্তরশৃঙ্খলে
কোটি কোটি যুগযুগান্তরে।
যে প্রথম যুগে তুমি দেখা দিলে নির্জন প্রান্তরে
রুদ্ধ অগ্নিতেজের উচ্ছ্বাস
উদ্‌ঘাটন করি দিল ভবিষ্যের ইতিহাস—
জীবের কঠিন দ্বন্দ্ব অন্তহীন,
দুঃখে সুখে যুদ্ধ রাত্রিদিন,
জ্বেলে ক্ষোভহুতাশন
অন্তরবিবরে যাহা সর্পসম করে আন্দোলন
শিখার রসনা
অশান্ত বাসনা।
স্নিগ্ধ স্তব্ধ রূপে
শ্যামল শান্তিতে তুমি চুপে চুপে
ধরণীর রঙ্গভূমে রচি দিলে কী ভূমিকা,—
তারি মাঝে প্রাণীর হৃদয়রক্তে লিখা
মহানাট্য জীবনমৃত্যুর,
কঠিন নিষ্ঠুর
দুর্গম পথের দুঃসাহস।

যে পতাকা উর্ধ্ব-পানে তুলেছিলে নিরলস,
বলো কে জানিত, তাহা নিরন্তর যুদ্ধের পতাকা,
সৌম্যকান্তি দিয়ে ঢাকা।

কে জানিত, আজ আমি এ-জন্মের জীবন মন্থিয়া
যে বাণী উদ্ধার করি চলেছি গ্রন্থিয়া
দিনে দিনে আমার আয়ুতে
সে যুগের বসন্তবায়ুতে
প্রথম নীরব মন্ত্র তারি
ভাষাহারা মর্মরেতে দিয়েছ বিস্তারি
তুমি, বনস্পতি,
মোর জ্যোতিবন্দনায় জন্মপূর্ব প্রথম প্রণতি।

২৬ চৈত্র, ১৩৩৯

কবি

এতদিনে বুঝিলাম, এ হৃদয় মরু না
ঋতুপতি তার প্রতি আজো করে করুণা।
মাঘ মাসে শুরু হল অনুকূল করদান,
অন্তরে কোন্ মায়ামন্তরে বরদান।
ফাল্গুনে কুসুমিতা কী মাধুরী তরুণা,
পলাশবীথিকা কার অনুরাগে অরুণা।

নীরবে করবী যবে আশা দিল হতাশে
ভুলেও তোলেনি মোর বয়সের কথা সে।
ওই দেখো অশোকের শ্যামঘন আঙিনায়
কৃপণতা কিছু নাই কুসুমের রাঙিমায়।
সৌরভগরবিনী তাবামণি লতা সে
আমার ললাট-'পরে কেন অবনতা সে।

চম্পকতরু মোরে প্রিয়সখা জানে যে,
গন্ধের ইঙ্গিতে কাছে তাই টানে যে।
মধুকরবন্দিত নন্দিত সহকার
মুকুলিত নতশাখে মুখে চাহে কহো কার।
ছায়াতলে মোর সাথে কথা কানে কানে যে,
দোয়েল মিলায় তান সে আমারি গানে যে।

পিকরবে সাড়া যবে দেয় পিকবনিতা
কবির ভাষায় সে যে চায় তারি ভণিতা।
বোবা দক্ষিণ হাওয়া ফেরে হেথাসেথা হায়,
আমি না রহিলে, বলো, কথা দেবে কে তাহায়।
পুষ্পচয়িনী বধূ কিংকিণীক্বণিতা,
অকথিতা বাণী তার কার সুরে ধ্বনিতা।

৮ কার্তিক, ১৩৩৮
[দার্জিলিং]

ছন্দোমাধুরী

পাষাণে-বাঁধা কঠোর পথ
'চলেছে তাহে কালের রথ,
ঘুরিছে তার মমতাহীন চাকা।
বিরোধ উঠে ঘর্ঘরিয়া,
বাতাস উঠে জর্জরিয়া
তৃষ্ণাভরা তপ্তবালু-ঢাকা।
নিঠুর লোভ জগৎ ব্যেপে
দুর্বলেরে মারিছে চেপে,
মথিয়া তুলে হিংসাহলাহল।
অর্থহীন কিসের তরে
এ কাড়াকাড়ি ধুলার 'পরে
লজ্জাহীন বেসুর কোলাহল।
হতাশ হয়ে যেদিকে চাহি
কোথাও কোনো উপায় নাহি,
মানুষরূপে দাঁড়ায় বিভীষিকা।
করুণাহীন দারুণ ঝড়ে
দেশে বিদেশে ছড়িয়ে পড়ে
অন্যায়ের প্রলয়ানলশিখা।

সহসা দেখি, সুন্দর হে,
কে দূতী তব বারতা বহে
ব্যাঘাত-মাঝে অকালে অস্থানে।
ছুটিয়া আসে গহন হতে
আত্মহারা উছল স্রোতে
রসের ধারা মরুভূমির পানে।

ছন্দভাঙা হাটের মাঝে
তরল তালে নূপুর বাজে,
বাতাসে যেন আকাশবাণী ফুটে।
কর্কশেরে নৃত্য হানি
ছন্দোময়ী মূর্তিখানি
ঘূর্ণিবেগে আবর্তিয়া উঠে।
ভরিয়া ঘট অমৃত আনে,
সে-কথা সে কি আপনি জানে—
এনেছে বহি সীমাহীনের ভাষা।
প্রবল এই মিথ্যাবাশি,
তারেও ঠেলি উঠেছে হাসি
অবলারূপে চিরকালের আশা।

১১ চৈত্র, ১৩৩৮

বিরোধ

এ সংসারে আছে বহু অপরাধ,
হেন অপবাদ
যখন ঘোষণা কর উচ্চ হতে উষ্ণ উচ্চারণে,
ভাবি মনে মনে,
ক্রোধের উত্তাপ তার
তোমার আপন অহংকার।
মন্দ ও ভালোর দ্বন্দ্ব, কে না জানে চিরকাল আছে
সৃষ্টির মর্মের কাছে।
না যদি সে রহে বিশ্ব ঘেরি
বিরুদ্ধ নির্ঘাতবেগে বাজে না শ্রেষ্ঠের জয়ভেরী।

বিধাতার 'পরে মিথ্যা আনিয়ো না অভিযোগ
মৃত্যুদুঃখ কর যবে ভোগ;
মনে জেনো, মৃত্যুর মূল্যেই করি ক্রয়
এ জীবনে দুর্মূল্য যা, অমর্ত্য যা, যা-কিছু অক্ষয়
ভাঙনের আক্রমণ
সৃষ্টিকর্তা মানুষেরে আহ্বান করিছে অনুক্ষণ।
দুর্গমের বক্ষে থাকে দয়াহীন শ্রেয়
রুদ্রতীর্থযাত্রীর পাথেয়।

বহুভাগ্য সেই
জন্মিয়াছি এমন বিশ্বেই
নির্দোষ যা নয়।
দুঃখ লজ্জা ভয়
ছিন্ন সূত্রে জটিল গ্রন্থিতে
রচনার সামঞ্জস্য পদে পদে রয়েছে খণ্ডিতে

এই ত্রুটি দেখেছি যখন
শুনিনি কি সেই সঙ্গে বিশ্বব্যাপী গভীর ক্রন্দন
যুগে যুগে উচ্ছ্বসিতে থাকে ;—
দেখিনি কি আর্তচিত্ত উদ্‌বোধিয়া রাখে
মানুষের ইতিবৃত্ত বেদনার নিত্য আন্দোলনে।

উৎপীড়িত সেই জাগরণে
তন্দ্রাহীন যে-মহিমা যাত্রা করে রাত্রির আঁধারে
নমস্কার জানাই তাহারে।
নানা নামে আসিছে সে নানা অস্ত্র হাতে
কণ্টকিত অসম্মান অবাধে দলিয়া পদপাতে—
মরণেরে হানি—
প্রলয়ের পান্থ সেই, রক্তে মোর তাহারে আহ্বানি

শ্রাবণ, ১৩৪২
শান্তিনিকেতন

রাতের দান

পথের শেষে নিবিয়া আসে আলো,
গানের বেলা আজ ফুরালো।
কী নিয়ে তবে কাটিবে তব সন্ধ্যা।

রাত্রি নহে বন্ধ্যা,
অন্ধকারে না-দেখা ফুল ফুটায়ে তোলে সে যে—
দিনের অতি নিঠুর খর তেজে
যে-ফুল ফুটিল না,
যাহার মধুকণা
বনভূমির প্রত্যাশাতে গোপনে ছিল ব'লে
গিয়েছে কবে আকাশপথে চলে
তোমার উপবনের মৌমাছি
কৃপণ বনবীথিকাতলে বৃথা করুণা যাচি

আঁধারে-ফোটা সে-ফুল নহে ঘরেতে আনিবার,
সে-ফুলদলে গাঁথিবে না তো হার;
সে শুধু বুকে আনে
গন্ধে-ঢাকা নিভৃত অনুমানে
দিনের ঘন জনতামাঝে হারানো আঁখিখানি,
মৌনে-ডোবা বাণী;
সে শুধু আনে পাইনি যারে তাহারি পরিচিতি,
ঘটেনি যাহা ব্যাকুল তারি স্মৃতি।

স্বপনে-ঘেরা সুদূর তারা নিশার ডালি-ভরা
দিয়েছে দেখা, দেয়নি তবু ধরা;
রাতের ফুল দূরের ধ্যানে তেমনি কথা কবে,
অনধিগত সার্থকতা বুঝাবে অনুভবে,
না-জানা সেই না-ছোঁওয়া সেই পথের শেষ দান
বিদায়বেলা ভরিবে তব প্রাণ।

১৯ আষাঢ়, ১৩৪১

নব পরিচয়

জন্ম মোর বহি যবে
খেয়ার তরী এল ভবে
যে-আমি এল সে-তরীখানি বেয়ে,
ভাবিয়াছিনু বারে বারে
প্রথম হতে জানি তারে,
পরিচিত সে পুরানো সবচেয়ে।

হঠাৎ যবে হেনকালে
আবেশকুহেলিকাজালে
অরুণরেখা ছিদ্র দেয় আনি
আমার নব পরিচয়
চমকি উঠে মনোময়—
নূতন সে যে, নূতন তারে জানি।

বসন্তের ভরাস্রোতে
এসেছিল সে কোথা হতে
বহিয়া চিরযৌবনেরি ডালি।
অনন্তের হোমানলে
যে-যজ্ঞের শিখা জ্বলে,
সে-শিখা হতে এনেছে দীপ জ্বালি।

মিলিয়া যায় তারি সাথে
আশ্বিনেরি নবপ্রাতে
শিউলিবনে আলোটি যাহা পড়ে,
শব্দহীন কলরোলে
সে-নাচ তারি বুকে দোলে
যে-নাচ লাগে বৈশাখের ঝড়ে

এ-সংসারে সব সীমা
ছাড়ায়ে গেছে যে-মহিমা
ব্যাপিয়া আছে অতীতে অনাগতে,
মরণ করি অভিভব
আছেন চির যে-মানব
নিজেরে দেখি সে-পথিকের পথে।

সংসারের ঢেউখেলা
সহজে করি অবহেলা
রাজহংস চলেছে যেন ভেসে—
সিক্ত নাহি করে তারে,
মুক্ত রাখে পাখাটারে,
ঊর্ধ্বশিরে পড়িছে আলো এসে।

আনন্দিত মন আজি
কী সংগীতে উঠে বাজি,
বিশ্ববীণা পেয়েছি যেন বুকে।
সকল লাভ, সব ক্ষতি,
তুচ্ছ আজি হল অতি
দুঃখ সুখ ভুলে যাওয়ার সুখে।

২৯ এপ্রিল, ১৯৩৪
শান্তিনিকেতন

মরণমাতা

মরণমাতা, এই যে কচি প্রাণ,
বুকের এ যে দুলাল তব, তোমারি এ যে দান।
ধুলায় যবে নয়ন আঁধা,
জড়ের স্তূপে বিপুল বাধা,
তখন দেখি তোমারি কোলে নবীন শোভমান।

নবদিনের জাগরণের ধন,
গোপনে তারে লালন করে তিমির-আবরণ।
পরদাঢাকা তোমার রথে
বহিয়া আন প্রকাশপথে
নূতন আশা, নূতন ভাষা, নূতন আয়োজন।

চলে যে যায় চাহে না আর পিছু,
তোমারি হাতে সঁপিয়া যায় যা ছিল তার কিছু
তাহাই লয়ে মন্ত্র পড়ি
নূতন যুগ তোল যে গড়ি—
নূতন ভালোমন্দ কত, নূতন উঁচুনিচু।

রোধিয়া পথ আমি না রব থামি ;
প্রাণের স্রোত অবাধে চলে তোমারি অনুগামী।
নিখিলধারা সে স্রোত বাহি
ভাঙিয়া সীমা চলিতে চাহি,
অচলরূপে রব না বাঁধা অবিচলিত আমি।

সহজে আমি মানিব অবসান,
ভাবী শিশুর জনমমাঝে নিজেরে দিব দান।
আজি রাতের যে-ফুলগুলি
জীবনে মম উঠিল দুলি
ঝরুক তারা কালি প্রাতের ফুলেরে দিতে প্রাণ।

৪ মাঘ. ১৩৩৮

মাতা

কুয়াসার জাল
আবরি রেখেছে প্রাতঃকাল—
সেইমতো ছিনু আমি কতদিন
আত্মপরিচয়হীন।
অস্পষ্ট স্বপ্নের মতো করেছিনু অনুভব
কুমারীচাঞ্চল্যতলে আছিল যে সঞ্চিত গৌরব,
যে নিরুদ্ধ আলোকের মুক্তির আভাস,
অনাগত দেবতার আসন্ন আশ্বাস,
পুষ্পকোরকের বক্ষে অগোচর ফলের মতন
তুই কোলে এলি যবে অমূল্য রতন,
অপূর্ব প্রভাতরবি,
আশার অতীত যেন প্রত্যাশার ছবি—
লভিলাম আপনার পূর্ণতারে
কাঙাল সংসারে।

প্রাণের রহস্য সুগভীর
অন্তরগুহায় ছিল স্থির
সে আজ বাহির হল দেহ লয়ে উন্মুক্ত আলোতে
অন্ধকার হতে ;
সুদীর্ঘকালের পথে
চলিল সুদূর ভবিষ্যতে।
যে আনন্দ আজি মোর শিরায় শিরায় বহে
গৃহের কোণের তাহা নহে।
আমার হৃদয় আজি পান্থশালা,
প্রাঙ্গণে হয়েছে দীপ জ্বালা।
হেথা কারে ডেকে আনিলাম
অনাদিকালের পান্থ কিছুকাল করিবে বিশ্রাম।

এ বিশ্বের যাত্রী যারা চলে অসীমের পানে
আকাশে আকাশে নৃত্যগানে—
আমার শিশুর মুখে কলকোলাহলে
সে-যাত্রীর গান আমি শুনিব এ বক্ষতলে
অতিশয় নিকটের, দূরের তবু এ,—
আপন অন্তরে এল, আপনার নহে তো কভু এ।
বন্ধনে দিয়েছে ধরা শুধু ছিন্ন করিতে বন্ধন;
আনন্দের ছন্দ টুটে উচ্ছ্বসিছে এ মোর ক্রন্দন।
জননীর
এ বেদনা, বিশ্বধরণীর
সে যে আপনার ধন—
না পারে রাখিতে নিজে, নিখিলেরে করে নিবেদন।

৮ অগস্ট, ১৯৩২
বরানগর

কাঠবিড়ালি

কাঠবিড়ালির ছানাদুটি
আঁচলতলায় ঢাকা,
পায় সে কোমল করুণ হাতে
পরশ সুধামাখা।
এই দেখাটি দেখে এলেম
ক্ষণকালের মাঝে,
সেই থেকে আজ আমার মনে
সুরের মতো বাজে
চাঁপাগাছের আড়াল থেকে
একলা সাঁঝের তারা
একটুখানি ক্ষীণ মাধুরী
জাগায় যেমনধারা,
তরল কলধ্বনি যেমন
বাজে জলের পাকে
গ্রামের ধারে বিজন ঘাটে
ছোটো নদীর বাঁকে,
লেবুর ডালে খুশি যেমন
প্রথম জেগে ওঠে
একটু যখন গন্ধ নিয়ে
একটি কুঁড়ি ফোটে,
দুপুর বেলায় পাখি যেমন—
দেখতে না পাই যাকে—
ঘন ছায়ায় সমস্ত দিন
মৃদুল সুরে ডাকে,
তেমনিতরো ঐ ছবিটির
মধুরসের কণা

ক্ষণকালের তরে আমায়
করেছে আনমনা।
দুঃখসুখের বোঝা নিয়ে
চলি আপন মনে,
তখন জীবনপথের ধারে
গোপন কোণে কোণে
হঠাৎ দেখি চিরাভ্যাসের
অন্তরালের কাছে
লক্ষ্মীদেবীর মালার থেকে
ছিন্ন পড়ে আছে
ধূলির সঙ্গে মিলিয়ে গিয়ে
টুকরো রতন কত—
আজকে আমার এই দেখাটি
দেখি তারির মতো।

২২ আষাঢ়, ১৩৪১
শান্তিনিকেতন

সাঁওতাল মেয়ে

যায় আসে সাঁওতাল মেয়ে
শিমুলগাছের তলে কাঁকরবিছানো পথ বেয়ে।
মোটা শাড়ি আঁট করে ঘিরে আছে তনু কালো দেহ।
বিধাতার ভোলা-মন কারিগর কেহ
কোন্ কালো পাখিটিরে গড়িতে গড়িতে
শ্রাবণের মেঘে ও তড়িতে
উপাদান খুঁজি
ওই নারী রচিয়াছে বুঝি।
ওর দুটি পাখা
ভিতরে অদৃশ্য আছে ঢাকা,
লঘু পায়ে মিলে গেছে চলা আর ওড়া।
নিটোল দু হাতে তার সাদারাঙা কয় জোড়া
গালা-ঢালা চুড়ি,
মাথায় মাটিতে-ভরা ঝুড়ি,
যাওয়া-আসা করে বারবার।
আঁচলের প্রান্ত তার
লাল রেখা দুলাইয়া
পলাশের স্পর্শমায়া আকাশেতে দেয় বুলাইয়া।

পউষের পালা হল শেষ,
উত্তর বাতাসে লাগে দক্ষিণের কচিৎ আবেশ।,
হিমঝুরি শাখা-'পরে
চিকন চঞ্চল পাতা ঝলমল করে
শীতের রোদ্দুরে।
পাণ্ডুনীল আকাশেতে চিল উড়ে যায় বহুদূরে।
আমলকীতলা ছেয়ে খ'সে পড়ে ফল,
জোটে সেথা ছেলেদের দল।

আঁকাবাঁকা বনপথে আলোছায়া গাঁথা,
অকস্মাৎ ঘুরে ঘুরে ওড়ে ঝরা পাতা
সচকিত হাওয়ার খেয়ালে।
ঝোপের আড়ালে
গলাফোলা গিরগিটি স্তব্ধ আছে ঘাসে।
ঝুড়ি নিয়ে বারবার সাঁওতাল মেয়ে যায় আসে।

আমার মাটির ঘরখানা
আরম্ভ হয়েছে গড়া, মজুর জুটেছে তার নানা।
ধীরে ধীরে ভিত তোলে গেঁথে
রৌদ্রে পিঠ পেতে।

মাঝে মাঝে
সুদূরে রেলের বাঁশি বাজে ;
প্রহর চলিয়া যায়, বেলা পড়ে আসে,
ঢং ঢং ঘণ্টাধ্বনি জেগে ওঠে দিগন্ত-আকাশে।
আমি দেখি চেয়ে,
ঈষৎ সংকোচে ভাবি,— এ কিশোরী মেয়ে
পল্লীকোণে যে ঘরের তরে
করিয়াছে প্রস্ফুটিত দেহে ও অন্তরে
নারীর সহজ শক্তি আত্মনিবেদনপরা
শুশ্রূষার স্নিগ্ধসুধাভরা,
আমি তারে লাগিয়েছি কেনা কাজে করিতে মজুরি,—
মূল্যে যার অসম্মান সেই শক্তি করি চুরি
পয়সার দিয়ে সিঁধকাঠি।
সাঁওতাল মেয়ে ওই ঝুড়ি ভরে নিয়ে আসে মাটি।

৪ মাঘ, ১৩৪১
শান্তিনিকেতন

মিলনযাত্রা

চন্দনধূপের গন্ধ ঠাকুরদালান হতে আসে,
শানবাঁধা আঙিনার একপাশে
শিউলির তল
আচ্ছন্ন হতেছে অবিরল
ফুলের সর্বস্বনিবেদনে।
গৃহিণীর মৃতদেহ বাহির প্রাঙ্গণে
আনিয়াছে বহি ;
বিলাপের গুঞ্জরণ স্ফীত হয়ে ওঠে রহি রহি ;
শরতের সোনালি প্রভাতে
যে-আলোছায়াতে
খচিত হয়েছে ফুলবন
মৃতদেহ-আবরণ
আশ্বিনের সেই ছায়া-আলো
অসংকোচে সহজে সাজালো।

জয়লক্ষ্মী এ ঘরের বিধবা ঘরনী
আসন্ন মরণকালে দুহিতারে কহিলেন, "মণি,
আগুনের সিংহদ্বারে চলেছি যে-দেশে
যাব সেথা বিবাহের বেশে।
আমারে পরায়ে দিয়ো লাল চেলিখানি,
সীমন্তে সিঁদুর দিয়ো টানি।"

যে উজ্জ্বল সাজে
একদিন নববধূ এসেছিল এ গৃহের মাঝে,
পার হয়েছিল যে-দুয়ার,
উত্তীর্ণ হল সে আরবার
সেই দ্বার সেই বেশে
ষাট বৎসরের শেষে।

এই দ্বার দিয়ে আর কভু
এ সংসারে ফিরিবে না সংসারের একচ্ছত্র প্রভু।
অক্ষুণ্ণ শাসনদণ্ড স্রস্ত হল তার,
ধনে জনে আছিল যে অবারিত অধিকার
আজি তার অর্থ কী যে।
যে-আসনে বসিত সে তারো চেয়ে মিথ্যা হল নিজে।

প্রিয়মিলনের মনোরথে
পরলোক-অভিসারপথে
রমণীর এই চিরপ্রস্থানের ক্ষণে
পড়িছে আরেক দিন মনে।—

আশ্বিনের শেষভাগে চলেছে পূজার আয়োজন;
দাসদাসী-কলকণ্ঠ-মুখরিত এ ভবন
উৎসবের উচ্ছল জোয়ারে
ক্ষুব্ধ চারিধারে।
এ বাড়ির ছোটো ছেলে অনুকূল পড়ে এম-এ ক্লাসে,
এসেছে পূজার অবকাশে।
শোভনদর্শন যুবা, সবচেয়ে প্রিয় জননীর,
বউদিদিমণ্ডলীর
প্রশ্রয়ভাজন।
পূজার উদ্‌যোগে মেশে তারো লাগি পূজার সাজন।

একদা বাড়ির কর্তা স্নেহভরে
পিতৃমাতৃহীন মেয়ে প্রমিতারে এনেছিল ঘরে
বন্ধুঘর হতে; তখন বয়স তার ছিল ছয়,
এ বাড়িতে পেল সে আশ্রয়
আত্মীয়ের মতো।

অমুদাদা কতদিন তারে কত
কাঁদায়েছে অত্যাচারে।
বালক রাজারে
যত সে জোগাত অর্ঘ্য ততই দৌরাত্ম্য যেত বেড়ে;
সগ্যবাঁধা খোঁপাখানি নেড়ে
হঠাৎ এলায়ে দিত চুল
অমুকূল;
চুরি করে খাতা খুলে
পেনসিলের দাগ দিয়ে লজ্জা দিত বানানের ভুলে।
গৃহিণী হাসিত দেখি দুজনের এ ছেলেমামুষি—
কভু রাগ, কভু খুশি,
কভু ঘোর অভিমানে পরস্পর এড়াইয়া চলা,
দীর্ঘকাল বন্ধ কথা বলা।

বহুদিন গেল তার পর।
প্রমির বয়স আজ আঠারো বছর।

হেনকালে একদা প্রভাতে
গৃহিণীর হাতে
চুপি চুপি ভৃত্য দিল আনি
রঙিন কাগজে লেখা পত্র একখানি।
অমুকূল লিখেছিল প্রমিতারে
বিবাহপ্রস্তাব করি তারে।
বলেছিল, "মায়ের সম্মতি
অসম্ভব অতি।
জাতের অমিল নিয়ে এ সংসারে
ঠেকিবে আচারে।

কথা যদি দাও, প্রমি, চুপি চুপি তবে
মোদের মিলন হবে
আইনের বলে।”

দুর্বিষহ ক্রোধানলে
জয়লক্ষ্মী তীব্র উঠে দহি।
দেওয়ানকে দিল কহি,
এ মুহূর্তে প্রমিতারে
দূর করি দাও একেবারে।”

ছুটিয়া মাতারে এসে বলে অনুকূল,
“করিয়ো না ভুল ;
অপরাধ নাই প্রমিতার,
সম্মতি পাইনি আজো তার।
কর্ত্রী তুমি এ সংসারে ;
তাই ব'লে অবিচারে
নিরাশ্রয় করি দিবে অনাথারে, হেন অধিকার
নাই নাই, নাইকো তোমার।
এই ঘরে ঠাঁই দিল পিতা ওরে,
তারি জোরে
হেথা ওর স্থান
তোমারি সমান।
বিনা অপরাধে
কী স্বত্বে তাড়াবে ওরে মিথ্যা পরিবাদে।”

ঈর্ষ্যাবিদ্বেষের বহ্নি দিল মাতৃমন ছেয়ে—
ওইটুকু মেয়ে
আমার সোনার ছেলে পর করে,
আগুন লাগিয়ে দেয় কচি হাতে এ প্রাচীন ঘরে।

অপরাধ! অনুকূল ওরে ভালোবাসে এই ঢের,
সীমা নেই এ অপরাধের।
যত তর্ক কর তুমি, যে যুক্তি দাও-না
ইহার পাওনা
ওই মেয়েটাকে হবে মেটাতে সত্বর।
আমারি এ ঘর,
আমারি এ ধনজন
আমারি শাসন,
আর কারো নয়,
আজই আমি দেব তার পরিচয়।

প্রমিতা যাবার বেলা ঘরে দিয়ে দ্বার
খুলে দিল সব অলংকার।
পরিল মিলের শাড়ি মোটাসুতা-বোন
কানে ছিল সোনা,
কোনো জন্মদিনে তার,
স্বর্গীয় কর্তার উপহার,
বাক্সে তুলি রাখিল শয্যায়।
ঘোমটায় সারামুখ ঢাকিল লজ্জায়।

যবে হতে গেল পার
সদরের দ্বার
কোথা হতে অকস্মাৎ
অনুকূল পাশে এসে ধরিল তাহার হাত
কৌতূহলী দাসদাসী সবলে ঠেলিয়া সবাকারে;
কহিল সে, "এই দ্বারে

এতদিনে মুক্ত হল এইবার
মিলনযাত্রার পথ প্রমিতার
যে শুনিতে চাও শোনো,
মোরা দোঁহে ফিরিব না এ দ্বারে কখনো।

৫ ভাদ্র, ১৩৪২
শান্তিনিকেতন

অন্তরতম

আপন মনে যে-কামনার চলেছি পিছুপিছু
নহে সে বেশি কিছু।
মরুভূমিতে করেছি আনাগোনা—
তৃষিত হিয়া চেয়েছে যাহা নহে সে হীরা সোনা,
পর্ণপুটে একটু শুধু জল,
উৎসতটে খেজুরবনে ক্ষণিক ছায়াতল।
সেইটুকুতে বিরোধ ঘোচে জীবন মরণের,
বিরাম জোটে শ্রান্ত চরণের।

হাটের হাওয়া ধুলায় ভরপুর,
তাহার কোলাহলের তলে একটুখানি সুর
সকল হতে দুর্লভ তা তবু সে নহে বেশি;
বৈশাখের তাপের শেষাশেষি
আকাশ-চাওয়া শুষ্ক মাটি-'পরে
হঠাৎ-ভেসে-আসা মেঘের ক্ষণকালের তরে
এক পসলা বৃষ্টিবরিষন,
দুঃস্বপন বক্ষে যবে শ্বাস নিরোধ করে
জাগিয়ে-দেওয়া করুণ পরশন;
এইটুকুরই অভাব গুরুভার,
না জেনে তবু ইহারই লাগি হৃদয়ে হাহাকার।

অনেক দুরাশারে
সাধনা ক'রে পেয়েছি তবু ফেলিয়া গেছি তারে।
যে-পাওয়া শুধু রক্তে নাচে, স্বপ্নে যাহা গাঁথা,
ছন্দে যার হল আসন পাতা,
খ্যাতিস্মৃতির পাষাণপটে রাখে না যাহা রেখা,
ফাল্গুনের সাঁঝতারায় কাহিনী যার লেখা,

সে-ভাষা মোর বাঁশিই শুধু জানে—
এই যা দান গিয়েছে মিশে গভীরতর প্রাণে,
করিনি যার আশা,
যাহার লাগি বাঁধিনি কোনো বাসা,
বাহিরে যার নাইকো ভার, যায় না দেখা যারে,
বেদনা তারি ব্যাপিয়া মোর নিখিল আপনারে।

৬ সেপ্টেম্বর, ১৯৩৪
শান্তিনিকেতন

বনস্পতি

কোথা হতে পেলে তুমি অতি পুরাতন
এ যৌবন,
হে তরু প্রবীণ
প্রতিদিন
জরাকে ঝরাও তুমি কী নিগূঢ় তেজে,
প্রতিদিন আস তুমি সেজে
সদ্য জীবনের মহিমায়।
প্রাচীনের সমুদ্রসীমায়
নবীন প্রভাত তার অক্লান্ত কিরণে
তোমাতে জাগায় লীলা নিরন্তর শ্যামলে হিরণে।
দিনে দিনে পথিকের দল
ক্লিষ্টপদতল
তব ছায়াবীথি দিয়ে রাত্রি-পানে ধায় নিরুদ্দেশ ;
আর তো ফেরে না তারা, যাত্রা করে শেষ।
তোমার নিশ্চল যাত্রা নব নব পল্লব-উদ্গমে,
ঋতুর গতির ভঙ্গে পুষ্পের উদ্যমে।

প্রাণের নির্ঝরলীলা স্তব্ধ রূপান্তরে
দিগন্তেরে পুলকিত করে।
তপোবনবালকের মতো
আবৃত্তি করিছ তুমি ফিরে ফিরে অবিরত
সঞ্জীবন সামমন্ত্রগাথা।
তোমার পুরানো পাতা
মাটিরে করিছে প্রত্যর্পণ
মাটির যা মর্ত্যধন ;
মৃত্যুভার সঁপিছে মৃত্যুরে
মর্মরিত আনন্দের সুরে।

সেইক্ষণে নবকিশলয়
রবিকর হতে করে জয়
প্রচ্ছন্ন আলোক,
অমর অশোক
সৃষ্টির প্রথম বাণী ;
বায়ু হতে লয় টানি
চিরপ্রবাহিত
নৃত্যের অমৃত।

২ অগস্ট, ১৯৩২

ভীষণ

বনস্পতি, তুমি যে ভীষণ,
ক্ষণে ক্ষণে আজিও তা মানে মোর মন।
প্রকাণ্ড মাহাত্ম্যবলে জিনেছিলে ধরা একদিন
যে আদি অরণ্যযুগে, আজি তাহা ক্ষীণ।
মানুষের বশ-মানা এই যে তোমায় আজ দেখি,
তোমার আপন রূপ এ কি।
আমার বিধান দিয়ে বেঁধেছি তোমারে
আমার বাসার চারিধারে।
ছায়া তব রেখেছি সংযমে।
দাঁড়ায়ে রয়েছ স্তব্ধ জনতাসংগমে
হাটের পথের ধারে।
নম্র পত্রভারে
কিংকরের মতো
আছ মোর বিলাসের অনুগত।
লীলাকাননের মাপে
তোমারে করেছি খর্ব। মৃদু কলালাপে
কর চিত্তবিনোদন,
এ ভাষা কি তোমার আপন।

একদিন এসেছিলে আদি বনভূমে;
জীবলোক মগ্ন ঘুমে,
তখনো মেলেনি চোখ,
দেখেনি আলোক।
সমুদ্রের তীরে তীরে শাখায় মিলায়ে শাখা
ধরার কঙ্কাল দিলে ঢাকা।
ছায়ায় বুনিয়া ছায়া স্তরে স্তরে
সবুজ মেঘের মতো ব্যাপ্ত হলে দিকে দিগন্তরে।

লতায় গুল্মেতে ঘন, মৃতগাছ শুষ্ক পাতাভরা,
আলোহীন পথহীন ধরা ;
অরণ্যের আর্দ্রগন্ধে নিবিড় বাতাস
যেন রুদ্ধশ্বাস
চলিতে না পারে।
সিন্ধুর তরঙ্গধ্বনি অন্ধকারে
গুমরিয়া উঠিতেছে জনশূন্য বিশ্বের বিলাপে ;
ভূমিকম্পে বনস্থলী কাঁপে ;
প্রচণ্ড নির্ঘোষে
বহু তরুভার বহি বহুদূর মাটি যায় ধ্বসে
গভীব পঙ্কের তলে।
সেদিনেব অন্ধ যুগে পীড়িত সে জলে স্থলে
তুমি তুলেছিলে মাথা।
বলিত বল্কলে তব গাঁথা
সে ভীষণ যুগেব আভাস।

যেথা তব আদিবাস
সে অবণ্যে একদিন মানুষ পশিল যবে
দেখা দিয়েছিলে তুমি ভীতিরূপে তার অনুভবে।
হে তুমি অমিত-আয়ু, তোমার উদ্দেশে
স্তবগান করেছে সে।
বাঁকাচোরা শাখা তব কত কী সংকেতে
অন্ধকারে শঙ্কা রেখেছিল পেতে।
বিকৃত বিরূপ মূর্তি মনে মনে দেখেছিল তারা
তোমার দুর্গমে দিশাহারা।

আদিম সে আরণ্যক ভয়
রক্তে নিয়ে এসেছিনু, আজিও সে-কথা মনে হয়।

বটের জটিল মূল আঁকাবাঁকা নেমে গেছে জলে ;
মসীকৃষ্ণ ছায়াতলে
দৃষ্টি মোর চলে যেত ভয়ের কৌতুকে,
দুরুদুরু বুকে
ফিরাতেম নয়ন তখনি।
যে-মূর্তি দেখেছি সেথা, শুনেছি যে-ধ্বনি
সে তো নহে আজিকার।
বহু লক্ষ বর্ষ আগে সৃষ্টি সে তোমার।
হে ভীষণ বনস্পতি,
সেদিন যে-নতি
মন্ত্র পড়ি দিয়েছি তোমারে,
আমার চৈতন্যতলে আজিও তা আছে একধারে।

২ অগস্ট, ১৯৩২

সন্ন্যাসী

হে সন্ন্যাসী, হে গম্ভীর, মহেশ্বর,
মন্দাকিনী প্রসারিল কত-না নির্ঝর
তোমারে বেষ্টন করি নৃত্যজালে।
তব উচ্চভালে
উৎক্ষিপ্ত শীকরবাষ্পে বাঁকা ইন্দ্রধনু
রহে তব শুভ্রতনু
বর্ণে বর্ণে বিচিত্র করিয়া।
কলহাস্যে মুখরিয়া
উদ্ধত নন্দীর রুষ্ট তর্জনীরে করে পরিহাস,
ক্ষণে ক্ষণে করে তব তপোনাশ;
নাহি মনে ভয়,
দূরে নাহি রয়,
দুর্বার দুরন্ত তারা শাসন না মানে,
তোমারে আপন সাথি জানে।
সকল নিয়মবন্ধহারা
আপন অধীর ছন্দে তোমারে নাচাতে চায় তারা
বাহু তব ধরি।
তুমি মনে মনে হাস ভৃঙ্গীর ভ্রূকুটি লক্ষ্য করি।
এদের প্রশ্রয় দিলে, তাই যত দুর্দামের দল
চরাচর ঘেরি ঘেরি করিছে উন্মত্ত কোলাহল
সমুদ্রতরঙ্গতালে, অরণ্যের দোলে,
যৌবনের উদ্‌বেল কল্লোলে।
আনে চাঞ্চল্যের অর্ঘ নিরন্তর তব শান্তি নাশি,
এই তো তোমার পূজা, জান তাহা হে ধীর সন্ন্যাসী।

৩ অগস্ট, ১৯৩২

হরিণী

হে হরিণী,
আকাশ লইবে জিনি
কেন তব এ অধ্যবসায়।
সুদূরের অভ্রপটে অগম্যেরে দেখা যায়,
কালো চোখে পড়ে তার স্বপ্নরূপ লিখা ;
এ কি মরীচিকা,
পিপাসার স্বরচিত মোহ,
এ কি আপনার সাথে আপন বিদ্রোহ।
নিজের দুঃসহ সঙ্গ হতে
ছুটে যেতে চাও কোনো নূতন আলোতে—
নিকটের সংকীর্ণতা করি ছেদ,
দিগন্তের নব নব যবনিকা করি দিয়া ভেদ।
আছ বিচ্ছেদের পারে ;
যারে তুমি জান নাই, রক্তে তুমি চিনিয়াছ যারে
সে যে ডাক দিয়ে গেছে যুগে যুগে যত হরিণীরে
বনে মাঠে গিরিতটে নদীতীরে,—
জানায়েছে অপূর্ব বারতা
কত শত বসন্তের আত্মবিহ্বলতা।
তারি লাগি বিশ্বভোলা মহা-অভিসার
হয়েছে দুর্বার ;
অদৃশ্যেরে সন্ধানের তরে
দাঁড়ায়েছ স্পর্ধাভরে ;
একান্ত উৎসুক তব প্রাণ
আকাশেরে করে ঘ্রাণ,—
কর্ণ করিয়াছে খাড়া,
বাতাসে বাতাসে আজি অশ্রুত বাণীর পায় সাড়া।

১ অগস্ট, ১৯৩২

গোধূলি

প্রাসাদভবনে নিচের তলায়
সারাদিন কতমতো
গৃহের সেবায় নিরত রয়েছ রত।
সেথা তুমি তব গৃহসীমানায়
বহু মানুষের সনে
শত গাঁঠে বাঁধা কর্মের বন্ধনে।
দিনশেষে আসে গোধূলির বেলা
ধূসর রক্তরাগে
ঘরের কোণায় দীপ জ্বালাবার আগে;
নীড়ে-ফেরা কাক দিয়ে শেষ ডাক
উড়িল আকাশতলে,
শেষ-আলো-আভা মিলায নদীর জলে।
হাওযা থেমে যায়, বনের শাখায়
আঁধাব জড়াযে ধবে;
নির্জন ছাযা কাঁপে ঝিল্লিব স্ববে।

তখন একাকী সব কাজ বাখি
প্রাসাদ-ছাদেব ধাবে
দাঁড়াও যখন নীবব অন্ধকাবে
জানি না তখন কী যে নাম তব,
চেনা তুমি নহ আর,
কোনো বন্ধনে নহ তুমি বাঁধিবার।
সেই ক্ষণকাল তব সঙ্গিনী
সুদূর সন্ধ্যাতারা,
সেই ক্ষণকাল তুমি পরিচয়হারা।
দিবসরাতির সীমা মিলে যায়;
নেমে এস তাবপরে,
ঘরের প্রদীপ আবার জ্বালাও ঘরে।

১৪ মাঘ [১৩৩৮]

বাধা

পূর্ণ করি নারী তার জীবনের থালি
প্রিয়ের চরণে প্রেম নিঃশেষিয়া দিতে গেল ঢালি,
ব্যর্থ হল পথ-খোঁজা,—
কহিল, "হে ভগবান, নিষ্ঠুর যে এ অর্ঘের বোঝা ;
আমার দিবস রাত্রি অসহ্য পেষণে
একান্ত পীড়িত আর্ত ; তাই সান্ত্বনার অন্বেষণে
এসেছি তোমার দ্বারে ; এ প্রেম তুমিই লও প্রভু।"

"লও লও" বারবার ডেকে বলে, তবু
দিতে পারে না যে তাকে
কৃপণের ধন-সম শিরা আঁকড়িয়া থাকে।

যেমন তুষাররাশি গিরিশিরে লগ্ন রহে,
কিছুতে স্রোত না বহে,
আপন নিষ্ফল কঠিনতা
দেয় তারে ব্যথা,
তেমনি সে নারী
নিশ্চল হৃদয়ভারে-ভারী
কেঁদে বলে, "কী ধনে আমার প্রেম দামি
সে যদি না বুঝেছিল, তুমি অন্তর্যামী,
তুমিও কি এরে চিনিবে না।
মানবজন্মের সব দেনা
শোধ করি লও, প্রভু, আমার সর্বস্ব রত্ন নিয়ে।
তুমি যে প্রেমের লোভী মিথ্যা কথা কি এ।"

"লও লও" যত বলে খোলে না যে তার
হৃদয়ের দ্বার।
সারাদিন মন্দিরা বাজায়ে করে গান,
"লও তুমি লও, ভগবান।"

৩ অগস্ট, ১৯৩২

দুই সখী

দুজন সখীরে
দূর হতে দেখেছিনু অজানার তীরে।
জানিনে কাদের ঘর; দ্বার খোলা আকাশের পানে,
দিনান্তে কহিতেছিল কী কথা কে জানে।
এক নিমিষেতে
অপরিচয়ের দেখা চলে যেতে যেতে
উপরের দিকে চেয়ে।
দুটি মেয়ে
যেন দুটি আলোকণা
আমার মনের পথে ছায়াতলে করিল রচনা
ক্ষণতরে আকাশের বাণী,
অর্থ তার নাহি জানি।

যাহারা ওদের চেনে,
নাম জানে, কাছে লয় টেনে,
একসাথে দিন যাপে,
প্রত্যহের বিচিত্র আলাপে
ওদের বেঁধেছে তারা ছোটো ক'রে
পরিচয়ডোরে।

সত্য নয়
ঘরের ভিত্তিতে ঘেরা সেই পরিচয়।
যাবে দিন,
সে-জানা কোথায় হবে লীন।
বন্ধহীন অনন্তের বক্ষতলে উঠিয়াছে জেগে
কী নিশ্বাসবেগে

যুগলতরঙ্গসম।
অসীম কালের মাঝে ওরা অনুপম,
ওরা অনুদ্দেশ,
কোথায় ওদের শেষ
ঘরের মানুষ জানে সে কি।
নিত্যের চিত্তের পটে ক্ষণিকের চিত্র গেনু দেখি,
আশ্চর্য সে-লেখা ;—
সে-তুলির রেখা
যুগযুগান্তর-মাঝে একবার দেখা দিল নিজে,
জানিনে তাহার পরে কী যে।

[১৩৩৯]

পথিক

তুমি আছ বসি তোমার ঘরের দ্বারে
ছোটো তব সংসারে।
মনখানি যবে ধায় বাহিরের পানে
ভিতরে আবার টানে।
বাঁধনবিহীন দূর
বাজাইয়া যায় সুর,
বেদনার ছায়া পড়ে তব আঁখি'পরে,
নিশ্বাস ফেলি মন্দগমন ফিরে চলে যাও ঘরে।

আমি-যে পথিক চলিয়াছি পথ বেয়ে
দূরের আকাশে চেয়ে ;
তোমার ঘরের ছায়া পড়ে পথপাশে,
সে ছায়া হৃদয়ে আসে।
যতদূরে পথ যাক
শুনি বাঁধনের ডাক,
ক্ষণেকের তরে পিছনে আমায় টানে,
নিশ্বাস ফেলি ত্বরিতগমন চলি সম্মুখপানে।

উদার আকাশে আমার মুক্তি দেখি
মন তব কাঁদিছে কি।
এ-মুক্তিপথে তুমি পেতে চাও ছাড়া,
দুয়ারে লেগেছে নাড়া।
বাঁধনে বাঁধনে টানি
রচিলে আসনখানি,
দেখিনু তোমার আপন সৃষ্টি তাই।
শূন্যতা ছাড়ি সুন্দরে তব আমার মুক্তি চাই।

৩ অগস্ট, ১৯৩২

অপ্রকাশ

মুক্ত হও, হে সুন্দরী।
ছিন্ন করো রঙিন কুয়াশা,
অবনত দৃষ্টির আবেশ,
এই অবরুদ্ধ ভাষা,
এই অবগুন্ঠিত প্রকাশ।
সযত্ন লজ্জার ছায়া
তোমারে বেষ্টন করি জড়ায়েছে অস্পষ্টের মায়া
শত পাকে,
মোহ দিয়ে সৌন্দর্যেরে করেছে আবিল;
অপ্রকাশে হয়েছ অশুচি।
তাই তোমারে নিখিল
রেখেছে সরায়ে কোণে।
ব্যক্ত করিবার দীনতায়
নিজেরে হারালে তুমি,
প্রদোষের জ্যোতিঃক্ষীণতায়
দেখিতে পেলে না আজো আপনারে উদার আলোকে,—
বিশ্বেরে দেখনি, ভীরু, কোনোদিন বাধাহীন চোখে
উচ্চশির করি।

স্বরচিত সংকোচে কাটাও দিন,
আত্ম-অপমানে চিত্ত দীপ্তিহীন, তাই পুণ্যহীন।
বিকশিত স্থলপদ্ম পবিত্র সে, মুক্ত তার হাসি,
পূজায় পেয়েছে স্থান আপনারে সম্পূর্ণ বিকাশি।
ছায়াচ্ছন্ন যে-লজ্জায় প্রকাশের দীপ্তি ফেলে মুছি,
সত্তার ঘোষণাবাণী স্তব্ধ করে,
জেনো সে অশুচি।

উর্ধ্বশাখা বনস্পতি যে-ছায়ারে দিয়েছে আশ্রয়
তার সাথে আলোর মিত্রতা,
সমুন্নত সে বিনয়।
মাটিতে লুটিছে গুল্ম সর্ব অঙ্গ ছায়াপুঞ্জ করি,
তলে গুপ্ত গহ্বরেতে কীটের নিবাস।

হে সুন্দরী,
মুক্ত করো অসম্মান, তব অপ্রকাশ আবরণ।
হে বন্দিনী, বন্ধনেরে কোরো না কৃত্রিম আভরণ
সজ্জিত লজ্জার খাঁচা, সেথায় আত্মার অবসাদ,—
অর্ধেক বাধায় সেথা ভোগের বাড়ায়ে দিতে স্বাদ
ভোগীর বাড়াতে গর্ব খর্ব করিয়ো না আপনারে
খণ্ডিত জীবন লয়ে আচ্ছন্ন চিত্তের অন্ধকারে।

৬ মাঘ [১৩৩৮]

দুর্ভাগিনী

তোমার সম্মুখে এসে, দুর্ভাগিনী, দাঁড়াই যখন
নত হয় মন।
যেন ভয় লাগে
প্রলয়ের আরম্ভেতে স্তব্ধতার আগে।
এ কী দুঃখভার,
কী বিপুল বিষাদের স্তম্ভিত নীরন্ধ্র অন্ধকার
ব্যাপ্ত করে আছে তব সমস্ত জগৎ,
তব ভূত ভবিষ্যৎ।
প্রকাণ্ড এ নিষ্ফলতা,
অভ্রভেদী ব্যথা
দাবদগ্ধ পর্বতের মতো
খররৌদ্রে রয়েছে উন্নত
লয়ে নগ্ন কালো কালো শিলাস্তূপ
ভীষণ বিরূপ।

সব সান্ত্বনার শেষে সব পথ একেবারে
মিলেছে শূন্যের অন্ধকারে;
ফিরিছ বিশ্রামহারা ঘুরে ঘুরে,
খুঁজিছ কাছের বিশ্ব মুহূর্তে যা চলে গেল দূরে;
খুঁজিছ বুকের ধন, সে আর তো নেই,
বুকের পাথর হল মুহূর্তেই।
চিরচেনা ছিল চোখে চোখে,
অকস্মাৎ মিলালো অপরিচিত লোকে।
দেবতা যেখানে ছিল সেথা জ্বালাইতে গেলে ধূপ,
সেখানে বিদ্রূপ।

সর্বশূন্যতার ধারে
জীবনের পোড়ো ঘরে অবরুদ্ধ দ্বারে
দাও নাড়া ;
ভিতরে কে দিবে সাড়া।
মূর্ছাতুর আঁধারের উঠিছে নিশ্বাস।
ভাঙা বিশ্বে পড়ে আছে ভেঙে-পড়া বিপুল বিশ্বাস
তার কাছে নত হয় শির
চরম বেদনাশৈলে ঊর্ধ্বচূড় যাহার মন্দির।

মনে হয়, বেদনার মহেশ্বরী
তোমার জীবন ভরি
দুষ্কর তপস্যামগ্ন, মহাবিরহিণী
মহাদুঃখে করিছেন ঋণী
চিরদয়িতেরে।
তোমারে সরালো শত ফেরে
বিশ্ব হতে বৈরাগ্যের অন্তরাল।
দেশকাল
রয়েছে বাহিরে।
তুমি স্থির সীমাহীন নৈরাশ্যের তীরে
নির্বাক্ অপার নির্বাসনে।
অশ্রুহীন তোমার নয়নে
অবিশ্রাম প্রশ্ন জাগে যেন—
কেন, ওগো কেন!

৬ অগস্ট, ১৯৩২
[জোড়াসাঁকো]

গরবিনী

কে গো তুমি গরবিনী, সাবধানে থাক দূরে দূরে,
মর্ত্যধূলি-'পরে ঘৃণা বাজে তব নূপুরে নূপুরে।
তুমি যে অসাধারণ, তীব্র একা তুমি,
আকাশকুসুমসম অসংসক্ত রয়েছ কুসুমি।
বাহিরের প্রসাধনে যত্নে তুমি শুচি;
অকলঙ্ক তোমার কৃত্রিম রুচি;
সর্বদা সংশয়ে থাক পাছে কোথা হতে
হতভাগ্য কালো কীট পড়ে তব দীপের আলোতে
স্ফটিকেতে-ঢাকা।
অসামান্য সমাদরে আঁকা
তোমার জীবন
কৃপণের-কক্ষে-রাখা ছবির মতন
বহুমূল্য যবনিকা-অন্তরালে;—
ওগো অভাগিনী নারী, এই ছিল তোমার কপালে,
আপন প্রহরী তুমি, নিজে তুমি আপন বন্ধন।

আমি সাধারণ।
এ ধরাতলের
নির্বিচার স্পর্শ সকলের
দেহে মোর বহে যায়, লাগে মোর মনে—
সেই বলে বলী আমি, স্বত্ব মোর সকল ভুবনে।
মুক্ত আমি ধূলিতলে,
মুক্ত আমি অনাদৃত মলিনের দলে।
যত চিহ্ন লাগে দেহে, অশঙ্কিত প্রাণের শক্তিতে
শুদ্ধ হয়ে যায় সে চকিতে।

সম্মুখে আমার দেখো শালবন,
সে যে সাধারণ।
সবার একান্ত কাছে
আপনাবিস্মৃত হয়ে আছে।
মধ্যাহ্নবাতাসে
শুষ্ক পাতা ঘুরাইয়া ধূলির আবর্ত ছুটে আসে,—
শাখা তার অনায়াসে দেয় নাড়া,
পাতায় পাতায় তার কৌতুকের পড়ে সাড়া।
তবু সে অম্লান শুচি, নির্মল নিশ্বাসে
চৈত্রের আকাশে
বাতাস পবিত্র করে সুগন্ধবীজনে।
অসংকোচ ছায়া তার প্রসারিত সর্বসাধারণে।
সহজে নির্মল সে যে
দ্বিধাহীন জীবনের তেজে।

আমি সাধারণ।
তরুর মতন আমি, নদীর মতন।
মাটির বুকের কাছে থাকি ;
আলোরে ললাটে লই ডাকি
যে-আলোক উচ্চনীচ ইতরের,
বাহিরের ভিতরের।
সমস্ত পৃথিবী তুমি অবজ্ঞায় করেছ অশুচি,
গরবিনী, তাই সেই শক্তি গেছে ঘুচি
আপনার অন্তরে রহিতে অমলিনা,—
হায়, তুমি নিখিলের আশীর্বাদহীনা।

৪ অগস্ট, ১৯৩২

প্রলয়

আকাশের দূরত্ব যে চোখে তারে দূর ব'লে জানি,
মনে তারে দূর নাহি মানি।
কালের দূরত্ব সেও যত কেন হোক না নিষ্ঠুর
তবু সে দুঃসহ নহে দূর।
আঁধারের দূরত্বই কাছে থেকে রচে ব্যবধান,
চেতনা আবিল করে, তার হাতে নাই পরিত্রাণ
শুধু এই মাত্র নয়—
সে-যে সৃষ্টি করে নিত্য ভয়।
ছায়া দিয়ে রচি তুলে আঁকাবাঁকা দীর্ঘ উপছায়া,
জানারে অজানা করে, ঘেরে তারে অর্থহীনা মায়া।
পথ লুপ্ত করে দিয়ে যে-পথের করে সে নির্দেশ
নাই তার শেষ।
সে-পথ ভুলায়ে লয় দিনে দিনে দূর হতে দূরে
ধ্রুবতারাহীন অন্ধপুরে।

অগ্নিবন্যা বিস্তারিয়া যে-প্রলয় আনে মহাকাল,
চন্দ্রসূর্য লুপ্ত করে আবর্তে-ঘূর্ণিত জটাজাল,
দিব্য দীপ্তিচ্ছটায় সে সাজে,
বজ্রের ঝঞ্ঝনামন্দ্রে বক্ষে তার রুদ্রবীণা বাজে।
যে-বিশ্বে বেদনা হানে তাহারি দাহনে করে তার
পবিত্র সৎকার।
জীর্ণ জগতের ভস্ম যুগান্তের প্রচণ্ড নিশ্বাসে
লুপ্ত হয় ঝঞ্ঝার বাতাসে।
অবশেষে তপস্বীর তপস্যাবহ্নির শিখা হতে
নবসৃষ্টি উঠে আসে নিরঞ্জন নবীন আলোতে।

দানব বিলুপ্তি আনে, আঁধারের পঙ্কিল বুদ্‌বুদে
নিখিলের সৃষ্টি দেয় মুদে ;
কণ্ঠ দেয় রুদ্ধ করি, বাণী হতে ছিন্ন করে সুর,
ভাষা হতে অর্থ করে দূর ;
উদয়দিগন্তমুখে চাপা দেয় ঘন কালো আঁধি,
প্রেমেরে সে ফেলে বাঁধি
সংশয়ের ডোরে ;
ভক্তিপাত্র শূন্য করি শ্রদ্ধার অমৃত লয় হ'রে
মূক অন্ধ মৃত্তিকার স্তর,
জগদ্দল শিলা দিয়ে রচে সেথা মুক্তির কবর

১৪ সেপ্টেম্বর, ১৯৩৪

কলুষিত

শ্যামল প্রাণের উৎস হতে
অবারিত পুণ্যস্রোতে
ধৌত হয় এ বিশ্বধরণী
দিবসরজনী।
হে নগরী, আপনারে বঞ্চিত করেছ সেই স্নানে,
রচিয়াছ আবরণ কঠিন পাষাণে।
আছ নিত্য মলিন অশুচি,
তোমার ললাট হতে গেছে ঘুচি
প্রকৃতির স্বহস্তের লিখা
আশীর্বাদটিকা।
ঊষা দিব্যদীপ্তিহারা
তোমার দিগন্তে এসে। রজনীর তারা
তোমার আকাশভ্রষ্ট জাতিচ্যুত, নষ্ট মন্ত্র তার,
বিক্ষুব্ধ নিদ্রার
আলোড়নে ধ্যান তার অস্বচ্ছ আবিল,—
হারালো সে মিল
পূজাগন্ধী নন্দনের পারিজাত সাথে
শান্তিহীন রাতে।

হেথা সুন্দরের কোলে
স্বর্গের বীণার সুর ভ্রষ্ট হল ব'লে
উদ্ধত হয়েছে ঊর্ধ্বে বীভৎসের কোলাহল,
কৃত্রিমের কারাগারে বন্দীদল
গর্বভরে
শৃঙ্খলের পূজা করে।

দ্বেষ ঈর্ষা কুৎসার কলুষে
আলোহীন অন্তরের গুহাতলে হেথা রাখে পুষে
ইতরের অহংকার ;
গোপন দংশন তার ;
অশ্লীল তাহার ক্লিন্ন ভাষা
সৌজন্যসংযমনাশা ।
দুর্গন্ধ পঙ্কের দিয়ে দাগা
মুখোশের অন্তরালে করে শ্লাঘা ;
সুরঙ্গ খনন করে,
ব্যাপি দেয় নিন্দা ক্ষতি প্রতিবেশীদের ঘরে ঘরে ;
এই নিয়ে হাটে বাটে বাঁকা কটাক্ষের
ব্যঙ্গভঙ্গী, চতুর বাক্যের
কুটিল উল্লাস,
ক্রূর পরিহাস ।

এর চেয়ে আরণ্যক তীব্র হিংসা সেও
শতগুণে শ্রেয় ।
ছদ্মবেশ-অপগত
শক্তির সরল তেজে সমুদ্যত দাবাগ্নির মতো
প্রচণ্ডনির্ঘোষ ;
নির্মল তাহার রোষ,
তার নির্দয়তা
বীরত্বের মাহাত্ম্যে উন্নতা ।
প্রাণশক্তি তার মাঝে
অক্ষুণ্ন বিরাজে ।

স্বাস্থ্যহীন বীর্যহীন যে-হীনতা ধ্বংসের বাহন
গর্তখোদা ক্রিমিগণ

তারি অনুচর,
অতি ক্ষুদ্র তাই তারা অতি ভয়ংকর ;
অগোচরে আনে মহামারী,
শনির কলির দণ্ড সর্বনাশ তারি।

মন মোর কেঁদে আজ উঠে জাগি
প্রবল মৃত্যুর লাগি।
রুদ্র, জটাবন্ধ হতে করো মুক্ত বিরাট প্লাবন,
নীচতার ক্লেদপঙ্কে করো রক্ষা ভীষণ, পাবন!
তাণ্ডবনৃত্যের ভরে
দুর্বলের যে-গ্লানিরে চূর্ণ কর যুগে যুগান্তরে
কাপুরুষ নির্জীবের সে নির্লজ্জ অপমানগুলি
বিলুপ্ত করিয়া দিক উৎক্ষিপ্ত তোমার পদধূলি।

১৪ ভাদ্র, ১৩৪২
শান্তিনিকেতন

অভ্যুদয়

শত শত লোক চলে
শত শত পথে।
তারি মাঝে কোথা কোন্ রথে
সে আসিছে যার আজি নব অভ্যুদয়।
দিক্‌লক্ষ্মী গাহিল না জয়;
আজো রাজটিকা
ললাটে হল না তার লিখা।
নাই অস্ত্র, নাই সৈন্যদল,
অস্ফুট তাহার বাণী, কণ্ঠে নাহি বল।
সে কি নিজে জানে
আসিছে সে কী লাগিয়া,
আসে কোনখানে।
যুগের প্রচ্ছন্ন আশা করিছে রচনা
তার অভ্যর্থনা
কোন্ ভবিষ্যতে;
কোন্ অলক্ষিত পথে
আসিতেছে অর্ঘভার।
আকাশে ধ্বনিছে বারম্বার,
"মুখ তোলো,
আবরণ খোলো,—
হে বিজয়ী, হে নির্ভীক,
হে মহাপথিক,
তোমার চরণক্ষেপ পথে পথে দিকে দিকে
মুক্তির সংকেতচিহ্ন
যাক লিখে লিখে।"

বর্ষশেষ, ১৩৩৯

প্রতীক্ষা

গান

আজি বরষনমুখরিত
শ্রাবণরাতি।
স্মৃতিবেদনার মালা
একেলা গাঁথি।
আজি কোন্ ভুলে ভুলি
আঁধার ঘরেতে রাখি
দুয়ার খুলি;
মনে হয়, বুঝি আসিবে সে
মোর দুখরজনীর
মরমসাথি।

আসিছে সে ধারাজলে সুর লাগায়ে,
নীপবনে পুলক জাগায়ে।
যদিও বা নাহি আসে
তবু বৃথা আশ্বাসে
মিলন-আসনখানি
রয়েছি পাতি

২১ শ্রাবণ, ১৩৪২
.শান্তিনিকেতন

ছুটি

রমাদেবীর মৃত্যু উপলক্ষ্যে

ফাল্গুনের পূর্ণিমার আমন্ত্রণ পল্লবে পল্লবে
এখনি মুখর হল অধীর মর্মরকলরবে।
বৎসে, তুমি বৎসরে বৎসরে
সাড়া তারি দিতে মধুস্বরে;
আমাদের দূত হয়ে তোমার কণ্ঠের কলগান
উৎসবের পুষ্পাসনে বসন্তেরে করেছে আহ্বান।

নিষ্ঠুর শীতের দিনে গেলে তুমি রুগ্ন তনু বয়ে
আমাদের সকলের উৎকণ্ঠিত আশীর্বাদ লয়ে।
আশা করেছিনু মনে মনে—
নববসন্তের আগমনে
ফিরিয়া আসিবে যবে লবে আপনার চিরস্থান,
কাননলক্ষ্মীরে তুমি করিবে আনন্দ-অর্ঘদান।

এবার দক্ষিণবায়ু দুঃখের নিঃশ্বাস এল বহে;
তুমি তো এলে না ফিরে; এ আশ্রম তোমার বিরহে
বীথিকার ছায়ায় আলোকে
সুগভীর পরিব্যাপ্ত শোকে
কহিছে নির্বাক্‌বাণী বৈরাগ্যকরুণ ক্লান্ত সুরে,—
তাহারি রণনধ্বনি প্রান্তরে বাজিছে দূরে দূরে।

শিশুকাল হতে হেথা সুখে দুঃখে ভরা দিনরাত
করেছে তোমার প্রাণে বিচিত্র বর্ণের রেখাপাত।
কাশের মঞ্জরীশুভ্র দিশা;
নিস্তব্ধ মালতীঝরা নিশা;
প্রশান্ত শিউলিফোটা প্রভাত শিশিরে-ছলোছলো;
দিগন্ত-চমক-দেওয়া সূর্যাস্তের রশ্মি জ্বলোজ্বলো।

এখনো তেমনি হেথা আসিবে দিনের পরে দিন,—
তবুও সে আজ হতে চিরকাল রবে তুমি-হীন।
ব'সে আমাদের মাঝখানে
কভু যে তোমার গানে গানে
ভরিবে না সুখসন্ধ্যা, মনে হয়, অসম্ভব অতি,—
বর্ষে বর্ষে দিনে দিনে প্রমাণ করিবে সেই ক্ষতি।

বারে বারে নিতে তুমি গীতিস্রোতে কবি-আশীর্বাণী,
তাহারে আপন পাত্রে প্রণামে ফিরায়ে দিতে আনি।
জীবনের দেওয়া-নেওয়া সেই
ঘুচিল অন্তিম নিমেষেই ;
স্নেহোজ্জ্বল কল্যাণের সে সম্বন্ধ তোমার আমার
গানের নির্মাল্য সাথে নিয়ে গেলে মরণের পার।

হায় হায়, এত প্রিয়, এতই দুর্লভ যে-সঞ্চয়
একদিনে অকস্মাৎ তাবো যে ঘটিতে পারে লয়।
হে অসীম, তব বক্ষোমাঝে
তার ব্যথা কিছুই না বাজে,
সৃষ্টির নেপথ্যে সেও আছে তব দৃষ্টির ছায়ায় ;
স্তব্ধবীণা রঙ্গগৃহে মোবা বৃথা করি 'হায় হায়'।

হে বৎসে, যা দিয়েছিলে আমাদের আনন্দভাণ্ডারে
তারি স্মৃতিরূপে তুমি বিরাজ করিবে চারিধারে।
আমাদের আশ্রম-উৎসব
যখনি জাগাবে গীতরব
তখনি তাহার মাঝে অশ্রুত তোমার কণ্ঠস্বর
অশ্রুর আভাস দিয়ে অভিষিক্ত করিবে অন্তর।

১৮ মাঘ, ১৩৪১
[শান্তিনিকেতন]

বাদলসন্ধ্যা

গান

জানি জানি, তুমি এসেছ এ-পথে
মনের ভুলে।
তাই হোক, তবে তাই হোক, দ্বার
দিলেম খুলে।
এসেছ তুমি তো বিনা আভরণে,
মুখর নূপুর বাজে না চরণে,
তাই হোক, তবে তাই হোক, এসো
সহজ মনে।

ঐ তো মালতী ঝ'রে প'ড়ে যায়
মোর আঙিনায়,
শিথিল কবরী সাজাতে তোমার
লও-না তুলে।
না-হয় সহসা এসেছ এ পথে
মনের ভুলে।

কোনো আয়োজন নাই একেবারে,
সুর বাঁধা নাই এ বীণার তারে,
তাই হোক তবে, এসো হৃদয়ের
মৌনপারে।

ঝর ঝর বারি ঝরে বনমাঝে,
আমারি মনের সুর ঐ বাজে,

উতলা হাওয়ার তালে তালে মন
উঠিছে দুলে।
না-হয় সহসা এসেছ এ পথে
মনের ভুলে।

২৩ শ্রাবণ, ১৩৪২
শান্তিনিকেতন

জয়ী

রূপহীন, বর্ণহীন, চিরস্তব্ধ, নাই শব্দ সুর,
মহাতৃষ্ণা মরুতলে মেলিয়াছে আসন মৃত্যুর ;
সে মহানৈঃশব্দ-মাঝে বেজে ওঠে মানবের বাণী
বাধা নাহি মানি।

আস্ফালিছে লক্ষ লোল ফেনজিহ্বা নিষ্ঠুর নীলিমা—
তরঙ্গতাণ্ডবী মৃত্যু, কোথা তার নাহি হেরি সীমা ;
সে রুদ্র সমুদ্রতটে ধ্বনিতেছে মানবের বাণী
বাধা নাহি মানি।

আদিতম যুগ হতে অন্তহীন অন্ধকারপথে
আবর্তিছে বহ্নিচক্র কোটি কোটি নক্ষত্রের রথে ;
দুর্গম রহস্য ভেদি সেথা উঠে মানবের বাণী
বাধা নাহি মানি।

অণুতম অণুকণা আকাশে আকাশে নিত্যকাল
বর্ষিয়া বিদ্যুৎবিন্দু রচিছে রূপের ইন্দ্রজাল ;
নিরুদ্ধ প্রবেশদ্বারে উঠে সেথা মানবের বাণী
বাধা নাহি মানি।

চিত্তের গহনে যেথা দুরন্ত কামনা লোভ ক্রোধ
আত্মঘাতী মত্ততায় করিছে মুক্তির দ্বার রোধ
অন্ধতার অন্ধকারে উঠে সেথা মানবের বাণী
বাধা নাহি মানি।

বাদলরাত্রি

গান

কী বেদনা মোর জান সে কি তুমি, জান,
ওগো মিতা মোর, অনেক দূরের মিতা,
আজি এ নিবিড় তিমিরযামিনী
বিদ্যুৎ-সচকিতা।
বাদল বাতাস ব্যেপে
হৃদয় উঠিছে কেঁপে,
ওগো, সে কি তুমি জান।
উৎসুক এই দুখজাগরণ,
এ কি হবে হায় বৃথা।

ওগো মিতা মোর, অনেক দূরের মিতা,
আমার ভবনদ্বারে
রোপন করিলে যারে,
সজল হাওয়ার করুণ পরশে
সে-মালতী বিকশিতা,
ওগো, সে কি তুমি জান।

তুমি যার সুর দিয়েছিলে বাঁধি
মোর কোলে আজ উঠিছে সে কাঁদি,
ওগো, সে কি তুমি জান।
সেই যে তোমার বীণা সে কি বিস্মৃতা,
ওগো মিতা, মোর অনেক দূরের মিতা।

২৮ শ্রাবণ ১৩৪২
শান্তিনিকেতন

পত্র

অবকাশ ঘোরতর অল্প,
অতএব কবে লিখি গল্প।
সময়টা বিনা কাজে ন্যস্ত
তা নিয়েই সর্বদা ব্যস্ত।
তাই ছেড়ে দিতে হল শেষটা
কলমের ব্যবহার-চেষ্টা।
সারাবেলা চেয়ে থাকি শূন্যে,
বুঝি গতজন্মের পুণ্যে
পায় মোর উদাসীন চিত্ত
রূপে রূপে অরূপের বিত্ত।
নাহি তার সঞ্চয়তৃষ্ণা,
নষ্ট করাতে তার নিষ্ঠা।
মৌমাছি-স্বভাবটা পায় নাই,
ভবিষ্যতের কোনো দায় নাই।
ভ্রমর যেমন মধু নিচ্ছে
যখন যেমন তার ইচ্ছে।
অকিঞ্চনের মতো কুঞ্জে
নিত্য আলসরস ভুঞ্জে।
মৌচাক রচে না কী জন্যে—
ব্যর্থ বলিয়া তারে অন্যে
গাল দিক, খেদ নাই তা নিয়ে।
জীবনটা চলেছে সে বানিয়ে
আলোতে বাতাসে আর গন্ধে
আপন পাখা-নাড়ার ছন্দে।
জগতের উপকার করতে
চায় না সে প্রাণপণে মরতে,

কিম্বা সে নিজের শ্রীবৃদ্ধির
টিকি দেখিল না আজো সিদ্ধির।
কভু যার পায় নাই তত্ত্ব
তারি গুণগান নিয়ে মত্ত।
যাহা কিছু হয় নাই পষ্ট,
যা দিয়েছে না-পাওয়ার কষ্ট,
যা রয়েছে আভাসের বস্তু,
তারেই সে বলিয়াছে 'অস্তু'।
যাহা নহে গণনায় গণ্য
তারি রসে হয়েছে সে ধন্য।
তবে কেন চাও তারে আনতে
পাব্‌লিশরের চক্রান্তে।
যে-রবি চলেছে আজ অস্তে
দেবে সমালোচকের হস্তে?
বসে আছি, প্রলয়ের পথকার
কবে করিবেন তার সৎকার।
নিশীথিনী নেবে তারে বাহুতে,
তার আগে খাবে কেন রাহুতে,
কলমটা তবে আজ তোলা থাক,
স্তুতিনিন্দার দোলে দোলা থাক।—

আজি শুধু ধরণীর স্পর্শ
এনে দিক অন্তিম হর্ষ।
বোবা তরুলতিকার বাক্য
দিক তারে অসীমের সাক্ষ্য।

অভ্যাগত

গান

মনে হল যেন পেরিয়ে এলেম
অন্তবিহীন পথ
আসিতে তোমার দ্বারে,
মরুতীর হতে সুধাশ্যামলিম পারে।
পথ হতে আমি গাঁথিয়া এনেছি
সিক্ত যূথীর মালা
সকরুণ নিবেদনের গন্ধ-ঢালা,
লজ্জা দিয়ো না তারে।

সজল মেঘের ছায়া ঘনাইছে
বনে বনে,
পথ-হারানোর বাজিছে বেদনা
সমীরণে।
দূর হতে আমি দেখেছি তোমার
ঐ বাতায়নতলে
নিভৃতে প্রদীপ জ্বলে,
আমার এ আঁখি উৎসুক পাখি
ঝড়ের অন্ধকারে

২২ শ্রাবণ, ১৩৪২
শান্তিনিকেতন

মাটিতে-আলোতে

আরবার কোলে এল শরতের
শুভ্র দেবশিশু, মরতের
সবুজ কুটীরে। আরবার বুঝিতেছি মনে—
বৈকুণ্ঠের সুর যবে বেজে ওঠে মর্তের গগনে
মাটির বাঁশিতে, চিরন্তন রচে খেলাঘর
অনিত্যের প্রাঙ্গণের 'পর,
তখন সে সম্মিলিত লীলারস তারি
ভরে নিই যতটুকু পারি
আমার বাণীর পাত্রে, ছন্দের আনন্দে তারে
বহে নিই চেতনার শেষ পারে,—
বাক্য আর বাক্যহীন
সত্যে আর স্বপ্নে হয় লীন।

দ্যুলোকে ভূলোকে মিলে শ্যামলে সোনায়
মন্ত্র রেখে দিয়ে গেছে বর্ষে বর্ষে আঁখির কোণায়;
তাই প্রিয়মুখে
চক্ষু যে পরশটুকু পায়, তার দুঃখে সুখে
লাগে সুধা, লাগে সুর,
তার মাঝে সে রহস্য সুমধুর
অনুভব করি—
যাহা সুগভীর আছে ভরি
কচি ধানখেতে;
রিক্ত প্রান্তরের শেষে অরণ্যের নীলিম সংকেতে;
আমলকীপল্লবের পেলব উল্লাসে;
মঞ্জরিত কাশে;

অপরাহ্নকাল,
তুলিয়া গেরুয়াবর্ণ পাল
পাণ্ডুপীত বালুতট বেয়ে বেয়ে
যায় ধেয়ে
তন্বী তরী গতির বিদ্যুতে,
হেলে পড়ে যে-রহস্য সে ভঙ্গিটুকুতে ;
চটুল দোয়েল পাখি সবুজেতে চমক ঘটায়
কালো আর সাদার ছটায়
অকস্মাৎ ধায় দ্রুত শিরীষের উচ্চ শাখা-পানে,
চকিত সে ওড়াটিতে যে-রহস্য বিজড়িত গানে।

হে প্রেয়সী, এ জীবনে
তোমারে হেরিয়াছিনু যে-নয়নে
সে নহে কেবলমাত্র দেখার ইন্দ্রিয়,
সেখানে জ্বেলেছে দীপ বিশ্বের অন্তরতম প্রিয়।
আঁখিতারা সুন্দরের পরশমণির মায়া-ভরা,
দৃষ্টি মোর সে তো সৃষ্টি-করা।
তোমার যে-সত্তাখানি প্রকাশিলে মোর বেদনায়
কিছু জানা কিছু না-জানায়,
যারে লয়ে আলো আর মাটিতে মিতালি,
আমার ছন্দের ডালি
উৎসর্গ করেছি তারে বারে বারে ;
সেই উপহারে
পেয়েছে আপন অর্ঘ্য ধরণীর সকল সুন্দর।
আমার অন্তর
রচিয়াছে নিভৃত কুলায়
স্বর্গের-সোহাগে-ধন্য পবিত্র ধুলায়।

২৫ অগস্ট ১৯৩৫
শান্তিনিকেতন

মুক্তি

জয় করেছিনু মন, তাহা বুঝি নাই,
চলে গেনু তাই
নতশিরে।
মনে ক্ষীণ আশা ছিল, ডাকিবে সে ফিরে।
মানিল না হার,
আমারে করিল অস্বীকার।
বাহিরে রহিনু খাড়া
কিছুকাল, না পেলেম সাড়া।
তোরণদ্বারের কাছে
চাঁপাগাছে
দক্ষিণ বাতাসে থরথরি
অন্ধকারে পাতাগুলি উঠিল মর্মরি।
দাঁড়ালেম পথপাশে,
ঊর্ধ্বে বাতায়ন-পানে তাকালেম ব্যর্থ কী আশ্বাসে
দেখিনু নিবানো বাতি;
আত্মগুপ্ত অহংকৃত রাতি
কক্ষ হতে পথিকেরে হানিছে ভ্রূকুটি।

এ কথা ভাবিনি মনে, অন্ধকারে ভূমিতলে লুটি
হয়তো সে করিতেছে খান খান
তীব্রঘাতে আপনার অভিমান।
দূর হতে দূরে গেনু সরে
প্রত্যাখ্যানলাঞ্ছনার বোঝা বক্ষে ধরে।
চরের বালুতে ঠেকা
পরিত্যক্ত তরীসম রহিল সে একা।

আশ্বিনের ভোরবেলা চেয়ে দেখি পথে যেতে যেতে
ক্ষীণ কুয়াশায় ঢাকা কচি ধানখেতে
দাঁড়িয়ে রয়েছে বক,
দিগন্তে মেঘের গুচ্ছে দুলিয়াছে উষার অলক।
সহসা উঠিল বলি হৃদয় আমার,
দেখিলাম যাহা দেখিবার
নির্মল আলোকে
মোহমুক্ত চোখে।
কামনার যে-পিঞ্জরে শান্তিহীন
অবরুদ্ধ ছিনু এতদিন
নিষ্ঠুর আঘাতে তার
ভেঙে গেছে দ্বার,—
নিরন্তর আকাঙ্ক্ষার এসেছি বাহিরে
সীমাহীন বৈরাগ্যের তীরে।
আপনারে শীর্ণ করি
দিবসশর্বরী
ছিনু জাগি
মুক্তিভিক্ষা লাগি।
উন্মুক্ত বাতাসে
খাঁচার পাখির গান ছাড়া আজি পেয়েছে আকাশে।

সহসা দেখিনু প্রাতে
যে আমারে মুক্তি দিল আপনার হাতে
সে আজো রয়েছে পড়ি
আমারি সে ভেঙে-পড়া পিঞ্জর আঁকড়ি।

২০ ভাদ্র, ১৩৪২
[শান্তিনিকেতন]

দুঃখী

দুঃখী তুমি একা,
যেতে যেতে কটাক্ষেতে পেলে দেখা—
হোথা দুটি নরনারী নববসন্তের কুঞ্জবনে
দক্ষিণ পবনে।
বুঝি মনে হল, যেন চারিধার
সঙ্গীহীন তোমারেই দিতেছে ধিক্কার।
মনে হল, রোমাঞ্চিত অরণ্যের কিশলয়
এ তোমার নয়।
ঘনপুঞ্জ অশোকমঞ্জরী
বাতাসের আন্দোলনে ঝরি ঝরি
প্রহরে প্রহরে
যে-নৃত্যের তরে
বিছাইছে আস্তরণ বনবীথিময়
সে তোমার নয়।
ফাল্গুনের এই ছন্দ, এই গান,
এই মাধুর্যের দান,
যুগে যুগান্তরে
শুধু মধুরের তরে
কমলার আশীর্বাদ করিছে সঞ্চয়,
সে তোমার নয়।
অপর্যাপ্ত ঐশ্বর্যের মাঝখান দিয়া
অকিঞ্চনহিয়া
চলিয়াছ দিনরাতি,
নাই সাথি,
পাথেয় সম্বল নাই প্রাণে,
শুধু কানে

চারিদিক হতে সবে কয়—
এ তোমার নয়।

তবু মনে রেখো, হে পথিক,
দুর্ভাগ্য তোমার চেয়ে অনেক অধিক
আছে ভবে।
দুই জনে পাশাপাশি যবে
রহে একা, তার চেয়ে একা কিছু নাই এ ভুবনে।
দুজনার অসংলগ্ন মনে
ছিদ্রময় যৌবনের তরী
অশ্রুর তরঙ্গে ওঠে ভরি;
বসন্তের রসরাশি সেও হয় দারুণ দুর্বহ,
যুগলের নিঃসঙ্গতা নিষ্ঠুর বিরহ।

তুমি একা, রিক্ত তব চিত্তাকাশে কোনো বিঘ্ন নাই;
সেথা পায় ঠাঁই
পান্থ মেঘদল;
লয়ে রবিরশ্মি, লয়ে অশ্রুজল
ক্ষণিকের স্বপ্নস্বর্গ করিয়া রচনা
অস্তসমুদ্রের পারে ভেসে তারা যায় অন্যমনা।

চেয়ে দেখো, দোঁহে যারা হোথা আছে
কাছে-কাছে
তবু যাহাদের মাঝে
অন্তহীন বিচ্ছেদ বিরাজে,
কুসুমিত এ বসন্ত, এ আকাশ, এই বন,
খাঁচার মতন

রুদ্ধদ্বার, নাহি কহে কথা,
তারাও ওদের কাছে হারালো অপূর্ব অসীমতা।
দুজনের জীবনের মিলিত অঞ্জলি,
তাহারি শিথিল ফাঁকে দুজনের বিশ্ব পড়ে গলি।

৬ আষাঢ়, ১৩৪০
দার্জিলিং

মূল্য

আমি এ পথের ধারে
একা রই,—
যেতে যেতে যাহা কিছু ফেলে রেখে গেছ মোর দ্বারে
মূল্য তার হোক না যতই
তাহে মোর দেনা
পরিশোধ কখনো হবে না।

দেব ব'লে যাহা কভু দেওয়া নাহি যায়,
চেয়ে যাহা কেহ নাহি পায়,
যে-ধনের ভাণ্ডারের চাবি আছে
অন্তর্যামী কোন্ গুপ্ত দেবতার কাছে
কেহ নাহি জানে,—
আগন্তুক অকস্মাৎ সে দুর্লভ দানে
ভরিল তোমার হাত অন্যমনে পথে যাতায়াতে।

পড়ে ছিল গাছের তলাতে
দৈবাৎ বাতাসে ফল,
ক্ষুধার সম্বল।
অযাচিত সে সুযোগে খুশি হয়ে একটুকু হেসো;
তার বেশি দিতে যদি এস,
তবে জেনো, মূল্য নেই
মূল্য তার সেই।

দূরে যাও, ভুলে যাও ভালো সেও,—
তাহারে কোরো না হেয়
দানস্বীকারের ছলে
দাতার উদ্দেশে কিছু রেখে ধূলিতলে।

৭ সেপ্টেম্বর, ১৯৩৫
[শান্তিনিকেতন]

ঋতু-অবসান

একদা বসন্তে মোর বনশাখে যবে
মুকুলে পল্লবে
উদ্‌বারিত আনন্দের আমন্ত্রণ
গন্ধে বর্ণে দিল ব্যাপি ফাল্গুনের পবন গগন
সেদিন এসেছে যারা বীথিকায়—
কেহ এল কুণ্ঠিত দ্বিধায় ;
চটুল চরণ কারো তৃণে তৃণে বাঁকিয়া বাঁকিয়া
নির্দয় দলনচিহ্ন গিয়েছে আঁকিয়া
অসংকোচ নূপুরঝংকারে,
কটাক্ষের খরধারে
উচ্চহাস্য করেছে শাণিত।
কেহ বা করেছে ম্লান অমানিত
অকারণ সংশয়েতে আপনারে
অবগুণ্ঠনের অন্ধকারে।
কেহ তারা নিয়েছিল তুলি
গোপনে ছায়ায় ফিরি তরুতলে ঝরা ফুলগুলি।
কেহ ছিন্ন করি
তুলেছিল মাধবীমঞ্জরী—
কিছু তার পথে পথে ফেলেছে ছড়ায়ে,
কিছু তার বেণীতে জড়ায়ে
অন্যমনে গেছে চলে গুন্ গুন্ গানে।

আজি এ ঋতুর অবসানে
ছায়াঘন বীথি মোর নিস্তব্ধ নির্জন ;
মৌমাছির মধু আহরণ

হল সারা ;
সমীরণ গন্ধহারা
তৃণে তৃণে ফেলিছে নিশ্বাস।
পাতার আড়াল ভরি একে একে পেতেছে প্রকাশ
অচঞ্চল ফলগুচ্ছ যত,
শাখা অবনত।
নিয়ে সাজি
কোথা তারা গেল আজি,—
গোধূলিছায়াতে হল লীন
যারা এসেছিল একদিন
কলরবে কান্না ও হাসিতে
দিতে আর নিতে।

আজি লয়ে মোর দানভার
ভরিয়াছি নিভৃত অন্তর আপনার ;
অপ্রগল্‌ভ গূঢ় সার্থকতা
নাহি জানে কথা।
নিশীথ যেমন স্তব্ধ নিষুপ্ত ভুবনে
আপনার মনে
আপনার তারাগুলি
কোন্‌ বিরাটের পায়ে ধরিয়াছে তুলি
নাহি জানে আপনি সে,—
সুদূর প্রভাত-পানে চাহিয়া রয়েছে নির্নিমেষে।

১৯ ভাদ্র, ১৩৪২
[শান্তিনিকেতন]

নমস্কার

প্রভু,

সৃষ্টিতে তব আনন্দ আছে
মমত্ব নাই তবু,
ভাঙায় গড়ায় সমান তোমার লীলা।
তব নির্ঝরধারা
যে-বারতা বহি সাগরের পানে
চলেছে আত্মহারা
প্রতিবাদ তারি করিছে তোমার শিলা।
দোঁহার এ দুই বাণী,
ওগো উদাসীন, আপনার মনে
সমান নিতেছ মানি ;
সকল বিরোধ তাই তো তোমায়
চরমে হারায় বাণী।

বর্তমানের ছবি
দেখি যবে, দেখি, নাচে তার বুকে
ভৈরব ভৈরবী।
তুমি কী দেখিছ তুমিই তা জান
নিত্যকালের কবি—
কোন্ কালিমার সমুদ্রকূলে
উদয়াচলের রবি।

বুঝিছে মন্দ ভালো।
তোমার অসীম দৃষ্টিক্ষেত্রে
কালো সে রয় না কালো
অঙ্গার সে তো তোমার চক্ষে
ছদ্মবেশের আলো।

দুঃখ লজ্জা ভয়
ব্যাপিয়া চলেছে উগ্র যাতন
মানববিশ্বময় ;
সেই বেদনায় লভিছে জন্ম
বীরের বিপুল জয়
হে কঠোর, তুমি সম্মান দাও,
দাও না তো প্রশ্রয়

তপ্ত পাত্র ভরি
প্রসাদ তোমার রুদ্র জ্বালায়
দিয়েছ অগ্রসরি,—
যে আছে দীপ্ত তেজের পিপাসু
নিক তাহা পান করি ।

নিঠুর পীড়নে যার
তন্দ্রাবিহীন কঠিন দণ্ডে
মথিছে অন্ধকার,
তুলিছে আলোড়ি অমৃত জ্যোতি,
তাঁহারে নমস্কার ।

৩ অগস্ট, ১৯৩৫
শান্তিনিকেতন

আশ্বিনে

আকাশ আজিকে নির্মলতম নীল,
উজ্জ্বল আজি চাঁপার বরন আলো ;
সবুজে সোনায় ভূলোকে দ্যুলোকে মিল
দূরে-চাওয়া মোর নয়নে লেগেছে ভালো।
ঘাসে ঝ'রে-পড়া শিউলির সৌরভে
মন-কেমনের বেদনা বাতাসে লাগে।
মালতীবিতানে শালিকের কলরবে
কাজ-ছাড়া-পাওয়া ছুটির আভাস জাগে।
এমনি শরতে ছেলেবেলাকার দেশে
রূপকথাটির নবীন রাজার ছেলে
বাহিরে ছুটিত কী জানি কী উদ্দেশে
এপারের চিরপরিচিত ঘর ফেলে।
আজি মোর মনে সে রূপকথার মায়া
ঘনায়ে উঠিছে চাহিয়া আকাশ-পানে।
তেপান্তরের সুদূর আলোকছায়া
ছড়ায়ে পড়িল ঘরছাড়া মোর প্রাণে।
মন বলে, "ওগো অজানা বন্ধু, তব
সন্ধানে আমি সমুদ্রে দিব পাড়ি।
ব্যথিত হৃদয়ে পরশরতন লব
চিরসঞ্চিত দৈন্যের বোঝা ছাড়ি।
দিন গেছে মোর, বৃথা বয়ে গেছে রাতি,
বসন্ত গেছে দ্বারে দিয়ে মিছে নাড়া ;
খুঁজে পাই নাই শূন্য ঘরের সাথি,
বকুলগন্ধে দিয়েছিল বুঝি সাড়া।

আজি আশ্বিনে প্রিয়-ইঙ্গিতসম
নেমে আসে বাণী করুণ কিরণ-ঢালা ;
চিরজীবনের হারানো বন্ধু মম,
এবার এসেছে তোমারে খোঁজার পালা।

৭ সেপ্টেম্বর, ১৯৩৫
শান্তিনিকেতন

নিঃস্ব

কী আশা নিয়ে এসেছ হেথা উৎসবের দল।
অশোকতরুতল
অতিথি লাগি রাখেনি আয়োজন।
হায় সে নির্ধন
শুকানো গাছে আকাশে শাখা তুলি
কাঙালসম মেলেছে অঙ্গুলি;
সুরসভার অপ্সরার চরণঘাত মাগি
রয়েছে বৃথা জাগি।
আরেকদিন এসেছ যবে সেদিন ফুলে ফুলে
যৌবনের তুফান দিল তুলে।
দখিনবায়ে তরুণ ফাল্গুনে
শ্যামল বনবল্লভের পায়ের ধ্বনি শুনে
পল্লবের আসন দিল পাতি;
মর্মরিত প্রলাপবাণী কহিল সারারাতি।

যেয়ো না ফিরে, একটু তবু বোসো,
নিভৃত তার প্রাঙ্গণেতে এসেছ যদি বোসো।
ব্যাকুলতারি নীরব আবেদনে
যে-দিন গেছে সে দিনখানি জাগায়ে তোলো মনে।
যে-দান মৃদু হেসে
কিশোর কবে নিয়েছ তুলি, পরেছ কালো কেশে
তাহারি ছবি স্মরিয়ো মোর শুকানো শাখা-আগে
প্রভাতবেলা নবীনারুণরাগে।
সেদিনকার গানের থেকে চয়ন করি কথা
ভরিয়া তোলো আজি এ নীরবতা।

২৭ ভাদ্র, ১৩৪২
শান্তিনিকেতন

দেবতা

দেবতা মানবলোকে ধরা দিতে চায়
মানবের অনিত্য লীলায়।
মাঝে মাঝে দেখি তাই—
আমি যেন নাই,
ঝংকৃত বীণার তন্তুসম দেহখানা
হয় যেন অদৃশ্য অজানা
আকাশের অতিদূর সূক্ষ্ম নীলিমায়
সংগীতে হারায়ে যায়;
নিবিড় আনন্দরূপে
পল্লবের স্তূপে
আমলকীবীথিকার গাছে গাছে
ব্যাপ্ত হয় শরতের আলোকের নাচে।

প্রেয়সীর প্রেমে
প্রত্যহের ধূলি-আবরণ যায় নেমে
দৃষ্টি হতে, শ্রুতি হতে;
স্বর্গসুধাস্রোতে
ধৌত হয় নিখিলগগন—
যাহা দেখি, যাহা শুনি তাহা যে একান্ত অতুলন।
মর্ত্যের অমৃতরসে দেবতার রুচি
পাই যেন আপনাতে, সীমা হতে সীমা যায় ঘুচি।

দেবসেনাপতি
নিয়ে আসে আপনার দিব্যজ্যোতি
যখন মরণপণে হানি অমঙ্গল;
ত্যাগের বিপুল বল